৪০বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
উৎস মানুষ ৪০	নিরঞ্জন বিশ্বাস	২
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	বরুণ ভট্টাচার্য	৪
অমলেন্দুদা	স্বপ্নময় চক্রবর্তী	৭
আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি	আশীষ লাহিড়ী	৮
বিদ্যাসাগর	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১০
কলকাতায় ঝড়	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	১২
সুন্দরবন	অমলেশ চৌধুরী	১৫
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা	শিবাংশু মুখোপাধ্যায়	১৮
আমিই প্রকৃত ধার্মিক	নরেন্দ্র দাভোলকার	২৩
কোভিড, স্টিগমা ও সমাজ	অরুণালোক ভট্টাচার্য	২৬
হুগলি নদীর হাল-হকিকৎ	তপোব্রত সান্যাল	২৯
কখন ডাক্তার দেখাবেন	গৌতম মিস্ত্রী	৩২
প্রযুক্তি পেরিয়ে	অমিত চৌধুরী	৩৭
প্রবাদ-প্রবচন	রিনি নাথ	৩৮
চিঠিপত্র: বহুবিবাহ প্রসঙ্গে	শ্যামল ভদ্র	৪১
সংগঠন সংবাদ		৪৪

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ এস- ৩, নারায়ণপুর কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/

৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট:www.utsomanush.com/

ই মেল:utsamanush1980@gmail.com/ **ফেসবুক:**https://www.facebook.com/utsomanus

ISSN 0971-5800 / RN. 37375/80

সম্পাদকীয়

উৎস মানুষ চল্লিশ বছরে পা দিয়েছে গত জানুয়ারিতে। এই দীর্ঘ সময়ে অগণিত মানুষ কত ভাবে পত্রিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তবেই এই সুদীর্ঘ সময় পার করা সম্ভব হয়েছে। মূল কৃতিত্ব লেখক ও পাঠকের। বিজ্ঞান ও গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলি উৎস মানুষ-এর ভিতকে আরো মজবুত করেছে। পত্রিকা ছড়িয়ে দিয়েছে জেলায় জেলায়। এর ফলে অসম ও ত্রিপুরাতেও পত্রিকার পাঠক সমাজ গড়ে উঠেছে। লেটার প্রেস থেকে ডিটিপি-তে উত্তরণ একটি ইতিহাস। পত্রিকার লেখকদের বয়স ২৫ থেকে ৯০। এ সংখ্যাতেই এরকম অতিপ্রবীণ দুজন লেখক যাঁদের বয়স নব্বইয়ের কোঠায়,— অমলেশ চৌধুরী ও অঞ্জনকুমার সেনশর্মা সাম্প্রতিক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও সুন্দরবন নিয়ে লিখেছেন। এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। একনাগাড়ে কাজ করে চলেছেন, এখনো এঁরা সজাগ ও সমাজ সচেতন। কাজের স্বীকৃতি পাওয়াটা এ-ধরনের মানুষের কাছে গৌণ তা বলাই বাহুল্য। এ ধরনের মানুষের উৎস মানুষের পাশে থাকাটা খুব উৎসাহব্যঞ্জক।

এ বছরের শুরুতেই অদৃশ্য ভাইরাসের আক্রমণে এক অভূতপূর্ব অতিমারির বিপর্যয় মানুষের চলার স্বাভাবিক ছন্দকে বেসামাল করে দিয়েছে। স্মরণাতীতকালে মানুষকে এরকম গভীর সঙ্কটে পড়তে হয় নি। আমাদের চারপাশে এই অতিমারিতে আক্রান্ত অসুস্থ মানুষের প্রতি নির্দয়, নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা নেহাত কম নয়। কোথায় হারিয়ে গেল মূল্যবোধ? এ তো মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা! আমরা মানুষের প্রতি মানুষের এই আচরণকে ধিক্কার জানাই।

এ রাজ্যে গত মে মাসে সাইক্লোন উমপুন-এর তাণ্ডবলীলায় উপকূলবর্তী অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষ গভীর সঙ্কটে। প্রাণহানি, বাড়িঘর, চাষের জমি সব গেছে। ধ্বংসের সঠিক হিসেব আমরা এখনও জানিনা। উমপুনে ক্ষতিগ্রস্ত সেইসব পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

অন্যদিকে অতিমারি আমাদের কিছু অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী করে রাখল। যানবাহন, কলকারখানা, উড়োজাহাজ বন্ধ। দূষণমুক্ত প্রকৃতি। নেপালের লাগোয়া বিহারের সীতামারি জেলা থেকে এভারেস্ট দেখতে পেল মানুষ। চল্লিশ বছর পর এমন ঘটনা। জলন্ধর থেকে আড়াইশ মাইল দূরে ধৌলাধার গিরিশৃঙ্গ দেখা গেল। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবার মানসিকতা কী আমাদের আছে? আবার এরই ভেতর গত মে মাসে বিশাখাপত্তনমে একটি কারখানা থেকে স্টাইরিন গ্যাস লিক করে

১১ জনের প্রাণহানি হল। বিদেশী মালিকানার কারখানাটির নাকি পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। একথা প্রাসঙ্গিক যে ১৯৮৪-তে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট চালু করা হয়। যার প্রয়োগ ২০২০-তে এসে বিশাখাপত্তমে মুখ থুবড়ে পড়ল। আসামের বিস্তীর্ণ জলাভূমি আজ ধ্বংসের মুখে। আসামের বাঘজানে অয়েল ইন্ডিয়ার তৈলকূপের আগুন আজও নেভেনি ফলে মাগুরি মোটাপাঙে জলাভূমি বিপন্ন। ক্ষয়ক্ষতির কোনও হিসেব নেই। সেখানেও সরকারি সংস্থা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাল। পরিবেশ আইন না মানার খেসারত দিতে হল স্থানীয় অধিবাসীদের। প্রেসিডেন্সির ছাত্রী সীমন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৫-তে গ্যাস লিকে মারা যান। মেয়েটি নাকি ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল এমনই অভিযোগ করা হয়েছিল এবং মারা যাবার কারণ নাকি তাই। যার প্রতিবাদে পরিবার মামলা করল। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আদালতের রায় বেরল। অভিযুক্ত গ্যাস কোম্পানিকে ৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার আদেশ দেওয়া হল। মেয়েটি যে ঘরে থাকতেন তার লাগোয়া রাস্তায় গ্যাসের পাইপের ছিদ্র সারানো হয়নি। সংস্থার চূড়ান্ত গাফিলতিতে সীমন্তিকা চলে গেল।

এই সংখ্যায় উৎস মানুষের চল্লিশ বছরের সাথী শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জন বিশ্বাস তাঁদের স্থানীয় সংগঠনের ও উৎস মানুষ পাঠচক্রের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। আমাদের কাছে এটি একটি বড় পাওনা। সম্প্রতি উৎস মানুষের অভিভাবক-স্থানীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন। এই সংখ্যায় তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়েছে। ২০১৭-তে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দেন অমলেন্দুবাবু। জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তা যে নিছক ভাঁওতা স্মারক বক্তৃতায় জোরালোভাবে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কিছুটা অসহায় বোধ করছি। অনলাইন পত্রিকা বের করাটা আমাদের কাছে কেমন যেন বেসুরো। তবু গত সংখ্যা অনলাইন সংস্করণ বের করতে হয়েছে। গ্রাহকদের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। তাঁরা পত্রিকার মুদ্রিত কপি পাবেন। অবস্থা একটু স্বাভাবিক হলে আমরা সে চেষ্টা করব। আর একটা খবর আগাম জানিয়ে রাখি। আমরা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০-তে পত্রিকার বিশেষ 'হোমিওপ্যাথি' সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছি। ৬৪ পাতার সেই সংখ্যাটির দাম কিছু বেশি হবে। তবে গ্রাহকদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। পরিশেষে পাঠকদের কাছে একটি বিনীত আবেদন তাঁরা পত্রিকার লেখা নিয়ে তাঁদের মতামত জানাবেন।

উমা

উৎস মানুষের সাথে চল্লিশ বছর

নিরঞ্জন বিশ্বাস

সালটা ১৯৮০। আমার এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মী বন্ধু প্রয়াত সত্যরঞ্জন বাগচী আমাকে 'উৎস মানুষ' নামে একটি বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা পড়তে দিলেন। আমি পরপর গোটা তিনেক সংখ্যা নিজেও পড়লাম এবং কয়েকজন বন্ধুকেও পড়তে দিলাম। পত্রিকার বিশেষ কিছু লেখা যেমন 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী', ন্যাবা বা জন্ডিস বিষয়ক 'মালা বাড়ে রোগ সারে', 'শালগ্রাম শিলার বিজ্ঞান রহস্য' পড়ে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে কর্মসূচি গ্রহণ খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হল। পত্রিকার পাঠকবন্ধুদের নিয়ে আলোচনায় বসা হল। আলোচনার বিষয়বস্তু এইরূপ — ১. পত্রিকার সকল লেখাপত্র বোঝার জন্য 'উৎস মানুষ' পাঠচক্র গঠন করা হবে। ২. জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের ভ্রান্ত ভাবনাচিন্তা দূর করার জন্য কার্যসূচি গ্রহণ করা হবে।

উৎসাহ উদ্দীপনা সহ ১৯৮১ সালের মধ্যেই 'উৎসমানুষ পাঠচক্র' গঠন করা হল। স্থান — হেলেনা হোমিও সদন, হরিণঘাটা। পরিচালক সতীশ চন্দ্র মণ্ডল। এলাকায় সাপে কাটা, কুকুরে কামড়ান, জলাতঙ্ক, জন্ডিস ইত্যাদি নিরাময়ের ক্ষেত্রে ওঝার মন্ত্রপাঠ, থালাপড়া, মালাপড়া ইত্যাদির যে প্রচলন ছিল উৎস মানুষ পাঠচক্রে জনসাধারণকে সে ক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির পদ্ধতি ছিল ছবি প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, জনগণকে জাগ্রত করার জন্য সমস্বরে স্লোগান যেমন— ওঝার কেরামতি, সাপে কাটলে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন ইত্যাদি। এই প্রচেষ্টার সার্থক ফল এইরূপ — ১) সাপে কাটলে ওঝার কাছে যাওয়া বন্ধ হয়েছে, ২) সাপ দেখলেই মেরে ফেলা কিছুটা বন্ধ হয়েছে, সাপও যে প্রয়োজনীয় প্রাণী, আমাদের প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছে। ৩) বাবা-মা বছর দশেকের ছেলেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওঝার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, পাড়ার ছেলেরা সাপের প্রদর্শনী থেকে শিখেছে 'ওঝার কেরামতি কোনখানে বিষহীন সাপ যেইখানে' তারা জোর করে ছেলেকে কল্যাণী জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে ও পরে কলকাতা পিজি হাসপাতালে বছরখানেকের চিকিৎসায় সুস্থ করে তোলে। এটা উৎস মানুষের প্রথম দিককার ঘটনা। সেদিনকার ছেলেটি এখন সন্তানের বাবা। চন্দ্রবোড়া সাপ ছেলেটিকে কেটেছিল।

উৎস মানুষ পাঠচক্রকে এলাকার যুক্তিনির্ভর সামাজিক-সর্বজনীন সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা

হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশেষে ঠিক হয় যে নিয়মিত শরীরচর্চা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাই হল উপযুক্ত সমাধান। আরো ঠিক হয় যে নিয়মিত শরীরচর্চার সাথে ১৯৮১ থেকে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। হরিনাভি ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামের সদস্যগণ তাদের নারায়ণপুর গ্রামে প্রতিবছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করার সাগ্রহ সম্মতি প্রকাশ করে। উপস্থিত সকলে এই সম্মতিকে স্বাগত জানায়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মূল নিয়মগুলি ছিল— ১. নারায়ণপুর গ্রামের যে কোনও বয়সী পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলে এবং ২. নারায়ণপুর গ্রামবাসীর মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি সকলে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৩. গ্রামের মানুষের অর্থসাহায্যেই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৮২-র জানুয়ারি মাসের নির্দিষ্ট দিনে ও যথাসময়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান শুরু হল। স্থান— নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ। বিভিন্ন বয়সী এলাকার ছেলে-মেয়ে, বৌ-ঝি, পুরুষ-মহিলা, দাদু-দিদিমার অনাবিল অংশগ্রহণ দেখে ভাবলাম এদ্দিন খুব ভুল করেছি। খেলা-ধূলা, শরীর-চর্চায় অংশগ্রহণ জীবনের মূল চাহিদা— এদ্দিন একেই আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি।

ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তির পর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের পর্যালোচনার জন্য বলা হল। পর্যালোচনা হল এমন — ১. সকলের অংশগ্রহণ এত আন্তরিক ও উৎসব মুখর ছিল যে একে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা না বলে, বলা সঙ্গত ক্রীড়া উৎসব। ২. ক্রীড়া উৎসব একদিনে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ক্রীড়া উৎসবের বিভিন্ন ইভেন্টের জন্য যথাযথ সময় দিয়ে দু'দিনে সম্পন্ন করা উচিত। পর্যালোচনার সুপারিশ অনুযায়ী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় বছর থেকে নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব সমিতি নামে দুই দিনে সম্পন্ন হয়ে আসছে। রজত জয়ন্তী বর্ষ (২৫তম বর্ষ, ২০০৫) উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩ দিনের ক্রীড়া উৎসব উদ্‌যাপিত হয় উক্ত বর্ষে শেষের দিনটি এলাকার বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে আকর্ষণীয় যৌথ ক্রীড়া উৎসব পালিত হয়।

উৎস মানুষ পাঠচক্রের যাত্রা শুরুর বছরেই যুক্তি-নির্ভর সামাজিক-সর্বজনীন-সংস্কৃতি চর্চার অঙ্গ হিসেবে চালু হল নিয়মিত শরীরচর্চা। এরই ধারাবাহিকতায় এলাকার মানুষের আর্থিক সহায়তায় শুরু হল বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অভিনব এই প্রতিযোগিতায় এলাকার পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে ছেলে-বুড়ো সবাই অংশগ্রহণ করেন। অচিরেই এটি উৎসবের চেহারা নেয়। সেই থেকে নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব নামে এটি পরিচিত। ১৯৮৩ থেকে উৎস মানুষ পাঠচক্রের উত্তর রাজাপুরের সদস্যবৃন্দ আয়োজিত এই উৎসব আজও অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। উত্তর রাজাপুরের এই ক্রীড়া উৎসবে অনুপ্রাণিত হয়ে হরিণঘাটার বড়জাগুলিতে ২০০৯ থেকে এলাকার গোপাল একাডেমির মাঠে শুরু হয় একদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২০০৮ সালের বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসবে মাঠে উপস্থিত থাকতে পারিনি। একটু চিন্তায় ছিলাম বৈকি! ক্রীড়া উৎসবের পর উদ্যোক্তারা এসে খবর দিয়ে গেছে অন্যান্যবারের মতোই সফল হয়েছে, কোনো অসুবিধে হয় নি। শুনে ভালো লাগল। আমাদের সব সময়কার সুখ-দুঃখের বন্ধু, উপদেষ্টা অশোকবাবুকে জানালাম। অশোকবাবু একধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনাদের গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবটা আসলে একটা সাংস্কৃতিক উত্তরণ।' পরিণত বয়সের পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের আগ্রহ বেশি— ধর্ম কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। সকলের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। বেশ কয়েকবছর হল নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের বাৎসরিক আগমনী বার্তা এলাকার জনগণের কাছে পৌঁছনোর জন্য ড্রামসেট কেনা হয়েছে। এলাকার ছেলেমেয়েরা বাদ্য-বাজনা সহযোগে ক্রীড়া উৎসবের আগমনী বার্তা সকলের বাড়ির উঠোনে পৌঁছে দেয়। এলাকার লোকজন আত্মীয়স্বজন সহযোগে ঐ দুটো দিন মাঠে জড়ো হবার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

উৎস মানুষের সাথে পরিচয় হবার পর থেকে জীবনে ছোটবড় কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে চলার পথে যুক্তিনির্ভর পথটি খুঁজে বের করার আগ্রহ ও প্রবণতা কিছু কিছু লোকের মধ্যে দর্শনীয় রূপে ফুটে ওঠে। তার মধ্যে মরণোত্তর ক্রিয়াকর্মে যথাযথ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা তুলে ধরেছেন উ: রাজাপুর নিবাসী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। তিনি প্রচলিত প্রথায় শ্রাদ্ধাদির আয়োজন না করে তাঁর মায়ের জীবন ও কার্যাবলী নিয়ে ২৬.১০.১৯৮৩ তারিখে এলাকায় প্রথম স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে আমাদের আশপাশের এলাকায় এ পর্যন্ত ষাটোর্দ্ধ স্মৃতিচারণ সভার মাধ্যমে শ্রদ্ধেয় প্রয়াতের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই কথা বললে আশা করি অত্যুক্তি হবে না যে আমাদের এলাকায় সতীশবাবুর পরে যাঁরা স্মৃতিচারণ সভার আয়োজন করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্যই প্রচ্ছন্নভাবে সতীশবাবুর অবদান রয়ে গেছে। এজন্য এলাকার পথপ্রদর্শক রূপে তাঁকে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এলাকায় চলার পথে উৎস মানুষকে আমরা শুধু কাগজে-কলমে পেয়েছি তা নয়, আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রে চলার পথে উৎস মানুষের পরিচালকমণ্ডলীকে সব সময়েই পাশে পেয়েছি। আমাদের বাৎসরিক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে হরিণঘাটা ব্লকের নারায়ণপুর, উত্তর রাজাপুর ও বড়জাগুলি এলাকার ক্রীড়া উৎসবের মাঠে, নারায়ণপুর নববধূ-পরিচিতি অনুষ্ঠানে, উত্তর রাজাপুর মরণোত্তর স্মৃতিচারণ সভায়, বড়জাগুলি-কালিবাজার

পরের অংশ ১১ পাতায়

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০২০)

শুধু কৃতী জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন, এক প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, নিরলস বিজ্ঞানকর্মী

বরুণ ভট্টাচার্য

উৎস মানুষের একান্ত আপনজন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন।

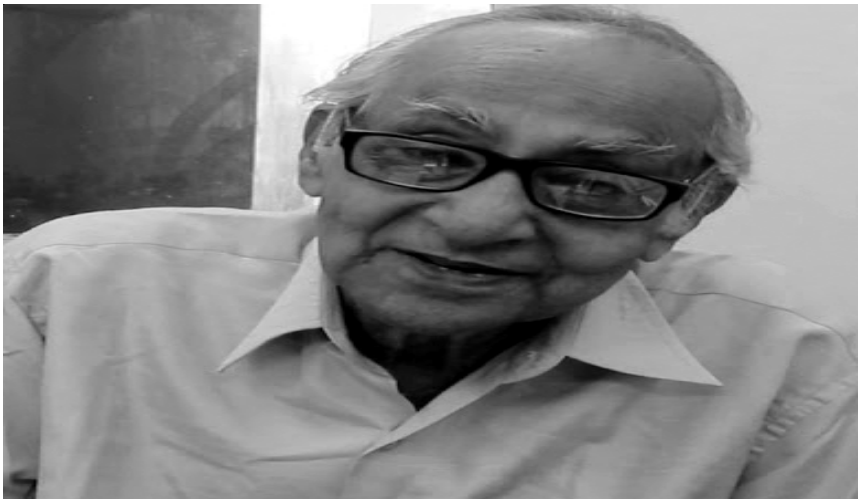

গত ২২ জুন রাতে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিষ বিরোধিতায় আপোষহীন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই পুত্রকে। উৎস মানুষ আর একবার অভিভাবকহীন হল।

উৎস মানুষ পত্রিকা ও তার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ভীষণ ভালবাসতেন। বারবার বলতেন তোমরা এদ্দিন ধরে যে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছ এ খুব বড় কাজ। পত্রিকায় বিভিন্ন সময় লেখা দিয়েছেন। তাঁর জ্যোতিষ বিরোধী ভূমিকা খাঁটি সোনার চেয়ে বেশি খাঁটি ছিল। উৎস মানুষ আয়োজিত ৮ম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' ২০১৭-তে অনুষ্ঠানটি হয় বিড়লা তারামণ্ডল সেমিনার হলে। বক্তা অমলেন্দুবাবুর জবানিতে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা — 'এবার আমার জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনাতে আসি। ১৯৯১, ১৭ নভেম্বর রবিবার, কলকাতার খ্যাতনামা দি স্টেটসম্যান পত্রিকায় আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিষের বিরুদ্ধে। নিবন্ধের নাম 'ডু প্লানেটস রুল আওয়ার লাইভস?' সেদিন রোববার সকাল ৭টা ২০, আমার স্ত্রীর কাছে একটা টেলিফোন এল। অমলেন্দুবাবু কি বাড়ি আছেন? আমার স্ত্রী উত্তর দিলেন, উনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিতে গেছেন। তখন টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল উনি আজকে স্টেটসম্যানে একটা লেখা লিখেছেন জ্যোতিষের বিরুদ্ধে, ১০ দিনের মধ্যে আপনার স্বামীর লাশ পড়ে যাবে, আপনি সুনিশ্চিত বিধবা হবেন। ...শুনেছিলাম এটা করেছিল জুয়েলার্স আর জ্যোতিষীরা ...' [১]। ওঁর জ্যোতিষ বিরোধিতার আরেকটি নমুনা: অমলেন্দুবাবুর জবানিতে, '২০০১ সালে ইউজিসি একটা অসম্ভব বাজে কাজ করে ফেলল। ইউজিসি সারা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিল, আপনারা একটা বৈদিক জ্যোতিষ

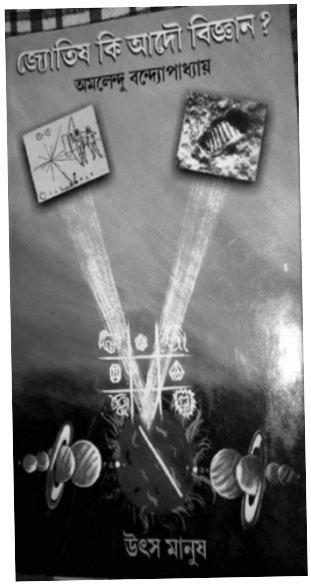

(বেদিক অ্যাস্ট্রোলজি) বিভাগ খুলুন, সেখানে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হবে, আমরা অনেক টাকা দেব। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হয় নি। সারা ভারতের দুটি কি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রাজি হল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ৩০ লক্ষ টাকা করে পেল। আমাদের মতো কিছু মানুষ, যাদের রক্ত স্ফুরিত হল— ইউনিভার্সিটিতে অ্যাস্ট্রোলজি ডিপার্টমেন্ট? তারই প্রতিবাদস্বরূপ আমি একটা বই লিখে ফেললাম— 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' ২০০১ সালের বইমেলার আর মাত্র ২২ দিন বাকি। আমি সল্টলেকে অশোকের [২] বাড়ি গেলাম। বললাম, অশোক, অত্যন্ত পরিশ্রম করে, রাত জেগে এই বইটি আমি লিখেছি। ইউজিসি-র পরিকল্পনার প্রতিবাদ। তুমি কি বইমেলার আগে এই বইটি ছাপতে পারবে? অশোক বলল, অমলেন্দুদা যেভাবেই হোক আমি বইটি ছাপাব। আমায় যদি প্রেসে বসে থাকতে হয়, না খেয়ে না দেয়ে হলেও এই বইটি ছাপব। অশোক সে অসাধ্য সাধন করল। বইমেলার ঠিক দু'দিন আগে উৎস মানুষ-এর প্রকাশনায় 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' বইটি প্রকাশ হল।'

জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ১৪২১-এ একটি শারদীয় সংখ্যায় 'পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ' নামে উপন্যাস লেখেন। সেটি উৎসর্গ করেন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উপন্যাসে আকাশ-পাগল অমিয় বড়াল ক্যানিং থেকে আসা মেধাবী ছাত্র নয়নচাঁদকে বলছেন 'আর একজন ভালো মানুষের ঠিকানা দিলাম, তাঁর নাম অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। উনি একজন বড় জ্যোতির্বিদ। ওঁর একটা ছোট প্রজেক্টর আছে। স্কুলে গিয়ে গিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহণ এসব ছবি দেখান। ওঁর একটা টেলিস্কোপও আছে। বিলিতি। আমার চেয়ে অনেক ভালো। পাগল লোক। বললে তোমাদের গ্রামেও চলে যাবেন। উনি আমার আকাশ-গুরু। প্ল্যানেটেরিয়ামে আলাপ। ওর মত হও।'

উপন্যাসের অমিয় বড়াল নয়নচাঁদকে যা বলতে পেরেছিলেন বাস্তবের অমিয় বড়ালরা নয়নচাঁদদের 'ওর মত হও' বলে কার কথা বলবেন? তেমন মানুষ সমাজে আর কই যাকে দেখলে মাথা আপনিই নুইয়ে যায়? সেই বিরল শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন একজন মানুষ যাঁর কথায় কাজে ফারাক ছিল না। সেই শ্রদ্ধার আসনটি ফাঁকা পড়ে রইল। তা বোধহয় থেকেই যাবে! অমলেন্দুবাবুর প্রয়াণে এ রাজ্যে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী চিন্তার যে সংস্কৃতি তার খুঁটি নড়ে গেল।

২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে টাইসম অফ ইন্ডিয়া 'স্টেলার পারফরমেন্স' লেখাটি প্রকাশ করে। পরদিন সকালে মোবাইল বেজে উঠল। ও প্রান্তে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখাটি পড়েছি কিনা জানতে চাইলেন। পত্রিকাটি রাখতাম, তখন বইমেলা চলছিল বলে পড়া হয়নি। তখুনি পত্রিকা বের করে ৯ পাতা খুলে দেখি অমলেন্দুবাবু ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকা বেশ বড়সড় ছবি সঙ্গে হাতে মাইক্রোফোন ধরা আরেকটা ছোট ছবি। এঁর লেখা বাংলা ও ইংরেজি কাগজে আমার মত অনেকেই মুগ্ধ হয়েছে। চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ কিংবা হঠাৎ করে বিপুলাকৃতির উল্কাপাত এসব ঘটনা ঘটার আগে আকাশবাণী ও দূরদর্শন থেকে অবধারিতভাবে ডাক পড়ত এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। সহজ-সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে ও ভাষায় মহাকাশ রহস্য বুঝিয়ে বলাটা তাঁর কাছে ছিল জলভাত। ওঁর কাছে শোনা দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বোঝা যাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের মত আপাত কঠিন বিষয় কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করতে পারতেন। ২০০৬ সালে তমলুক কলেজের মাঠে প্রায় ৭০০০ মানুষ মুখে টুঁ শব্দটি না করে অমলেন্দুবাবুর স্লাইড শো দেখেন। প্রায় সোয়া-ঘণ্টার শো শেষে কলেজের অধ্যক্ষ ওঁকে জিজ্ঞেস করেন 'আচ্ছা অমলেন্দুবাবু আপনি তো লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, অমিতাভ বচ্চন নন তাও এত মানুষ একমনে আপনার অনুষ্ঠান দেখলেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো?' অমলেন্দুবাবুর চোখ খুলে দেওয়া জবাব, 'আসলে কী জানেন, আকাশ, নক্ষত্র, চাঁদ, সূর্য এসব নিয়ে সবারই একটা কৌতূহল থাকে। আমি চেষ্টা করি ওদের মত করে পুরো ব্যাপারটা বোঝাতে। ঠিক জায়গা মত টোকা মারতে পারলে মানুষকে ভাল জিনিস বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। আমি সে চেষ্টাই করি।' মেদিনীপুরের কাঁকুড়দা, ঘাটাল, নদিয়ার চাকদহ, শান্তিপুর যেখানেই ডাক পেয়েছেন প্রজেক্টর আর টেলিস্কোপ ঘাড়ে করে পৌঁছে গেছেন। অমলেন্দুবাবুর স্লাইড শো দেখতে কোথাও ২০০০ কোথাও ৩০০০ মানুষ এসেছেন। এতটাই জনপ্রিয় উনি। গ্রামীণ দর্শক অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। সারা দেশে এরকম কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা আমরা শুনিনি। আয়োজকরা গাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে নিজের খরচাতেই চলে যেতেন। তমলুক থেকে তাইপে ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি, এই সেদিনও। তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সেমিনারই হোক বা এ রাজ্যের গ্রামগঞ্জে মহাকাশ রহস্য নিয়ে স্লাইড শো হোক— কর্মচঞ্চল মানুষটি বয়েস উপেক্ষা করে চলে যেতেন। স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সবাইকে তাঁর

অসামান্য বাচনভঙ্গি দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। অমলেন্দুবাবুর এই স্লাইড শো করার হাতেখড়ি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতজ্ঞ বিষ্ণু বাসুদেব নারলিকারের সঙ্গে আলাপ। অধ্যাপক নারলিকার বিভিন্ন স্লাইড শো অনুষ্ঠানে অমলেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিতেন। যা পরে ওঁর নেশা হয়ে দাঁড়ায়। উনি বলতেন — আমার বলার ধরনটা নারলিকারের থেকেই শেখা। অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন নারলিকারকে। বাগনানের কাছে মুগকল্যান গ্রামে হেডমাস্টার ছিলেন ওঁর বাবা। ছেলেবেলায় পুকুরে সাঁতার, দাপিয়ে ফুটবল খেলেছিলেন বলে শরীর বেশ মজবুত ছিল। বেনারসে পড়ার সময় আর্থিক প্রতিকূলতা এতটাই ছিল যে মাঝেমধ্যে জুতো হাতে নিয়ে হাঁটতেন পাছে তা ক্ষয়ে যায়। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে অ্যাস্ট্রনমি ও অ্যাস্ট্রলজি নিয়ে আলোচনার মধ্যে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ শুনে একটুও ঘাবড়াননি। জ্যোতিষ যে আসলে এক ভাঁওতা তা বোঝাতে কোপার্নিকাস, গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলা কিছু কথার উল্লেখ করতেন। এরকম সব টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ছে।

প্রবাদপ্রতিম মেঘনাদ সাহা ইন্ডিয়ান মেটেরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে অমলেন্দুবাবুকে ন্যাটিক্যাল আলম্যানক ইউনিটে নিয়ে আসেন। রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ প্রস্তুতির কাজে সেই সংস্থার সঙ্গে অমলেন্দবাবু যুক্ত হন। পরে ১৯৮০-তে কলকাতার পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারে প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর হিসেবে যোগ দেন। চাকরি জীবন শেষ করেন ঐ সংস্থা থেকে। এছাড়া বিড়লা তারামণ্ডলের পঠন-পাঠন-গবেষণা কাজে অমলেন্দুবাবু মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সেখানে আমৃত্যু সিনিয়র সায়েন্টিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। উনি দীর্ঘদিন মেঘনাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার পরিচালন কমিটিতে ছিলেন। এছাড়া লন্ডনের রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির আজীবন সদস্য ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানে অবদানের জন্য দেশ বিদেশে নানান সম্মান পান। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০১২-তে পাওয়া জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার। সব যে জানি তা-ও নয়। অমলেন্দুবাবুর মত মানুষদের নিজের ঢাক পেটাবার মত মানসিক ব্যামো থাকে না, ওঁরও তা ছিল না। প্রয়াণের পর বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে ওঁর স্মৃতিচারণ করে যেসব লেখা বেরোচ্ছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে ওঁর ঝুলিতে পুরস্কার রাখবার মত আর জায়গা ছিল না।

২২ তারিখ প্রয়াত হলেন। তারপর থেকে কলকাতা থেকে দূরের কয়েকটি জেলায় বেশ কিছু সংগঠন ও গোষ্ঠী স্মৃতিসভার আয়োজন করেছিল। তেমনি একটি গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের এড়াল, সেখান থেকে এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এরকম স্মৃতিসভার কথা জানালেন। লক্ষ্য করার বিষয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যারাই অমলেন্দুবাবুর স্লাইড শো দেখেছে, বিশেষ করে কলকাতার বাইরে, তারা মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেননি। প্রয়াণের পর এরকম শ্রদ্ধা ক'জনই বা পান?

বাড়িতে গেলে নিজে দরজা খোলা, বেরোলে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়া এসব শিষ্টাচার তো ছিলই। হয়ত রানাঘাটে আগের দিন শো ছিল আয়োজক সংস্থা সেখানকার পান্তুয়া দিয়েছে। পরদিন কেউ বাড়িতে গেলে না খেয়ে ফেরা যাবে না। সবসময়েই ছোট কোন অতিদরিদ্র মেয়েকে বাড়িতে এনে রাখতেন। তাকে স্থানীয় স্কুলে পড়ানো থেকে শুরু করে যাবতীয় দায়িত্ব নিতেন। এরকম জনা তিনেক মেয়েকে দেখেছি। একদিন বললেন, জানো এরা পড়াশুনা শিখুক বাপ-মা চায় না, বলে কি বিয়ের পাত্র পেতে অসুবিধে হবে, বোঝ কাণ্ড!

ছোটবেলায় স্কুলের মাস্টারমশাই প্লেন লিভিং হাই থিংকিং বোঝাতে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কথা বলতেন। আমাদের কাছে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ভূ-ভারতে এরকম মানুষ আর কেউ আছেন কিনা জানিনা। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে নিবেদিত প্রাণ, জ্যোতিষের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

দ্রষ্টব্য :

১) উৎস মানুষ (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮) (www.utsomanush.com)

২) উৎস মানুষের প্রয়াত সম্পাদক।

উমা

উৎস মানুষ
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০
সংখ্যাটির বিষয় **হোমিওপ্যাথি**।
এটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে
প্রকাশিত হবে।

আমার দেখা অমলেন্দুদা

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

আমার জীবনে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তিস্বার্থশূন্য, জনদরদী, আপসহীন প্রণম্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, ঘটনাক্রমে তাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। এবং যেহেতু বিজ্ঞানমনস্ক, তাই সাম্যবাদী। প্রকৃতির অন্তর্গত নিয়মকে নিয়ত সন্ধান করার অপর নাম বিজ্ঞান। পদার্থ, শরীর, মন, শক্তি, এই সব কিছুর মধ্যেই রহস্য রয়েছে, রহস্যভেদ করার চেষ্টাও রয়েছে। মহাকাশও আমাদের কাছে এক বিরাট রহস্য। আমাদের মাথার ওপরে থাকা লক্ষ কোটি আলোকবিন্দু, অগ্নি গোলক সূর্য, পেলব চাঁদ — সবই রহস্যে মোড়া ও অনেকটাই অজানা। এই অজানাকে জানতে চেষ্টা করেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই সঙ্গে জানাতে। এই অন্যকে জানানোর ঐকান্তিক চেষ্টার জন্যই তিনি অনন্য।

মানুষ যে কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য ও শ্রবণযোগ্য ঘটনার ব্যাখ্যা করে। কার্যকারণ খোঁজে। এই খোঁজই গল্পের জন্ম দেয়। গ্রহণ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, আলেয়া, বজ্রপাত এইসব প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার চেষ্টাই নানা কথা-কাহিনী ও কুবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। সত্যজ্ঞান সমবণ্টিত হয়না। যারা জেনেছে, তাদের দায়িত্ব যারা জানে না তাদের জানানোর। এজন্যই বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞানকর্মী, বিজ্ঞান পত্রিকা। অমলেন্দুদা যতটা বিজ্ঞানী ততটাই বিজ্ঞানকর্মী। তিনি পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের প্রধান ছিলেন, বিড়লা তারামণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র এক কথায় মহাকাশ নিয়ে চর্চা তার সূচনা ওঁর হাত ধরেই। সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যে গবেষণা ও পড়াশুনা হয় তার মধ্যমণি ছিলেন সদ্যপ্রয়াত অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। এছাড়া দেশে বিদেশে বহু সম্মান ও পুরস্কার পান অমলেন্দু দা। এসব আমাদের কাছে বড় কথা নয়। আমাদের কাছে তিনি চিরপ্রণম্য বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি স্কুল কলেজ ক্লাবগুলিতে নিজের টাকাতেই প্রজেক্টর ঘাড়ে নিয়ে চলে যেতেন ডাক পেলেই। একটা সময় ছিল যখন এলাকাকেন্দ্রিক কিছু ক্লাব বিজ্ঞান আলোচনা বসাতো। এখন সে রেওয়াজ বন্ধ করে দিয়েছি আমরা। ক্লাবগুলি মূলত উৎসব বসায় আর বিয়েবাড়ি হিসেবে ভাড়া দেয়। অমলেন্দুদার সঙ্গী আমিও দু-তিনবার। একবার মেদিনীপুরের এক গ্রামে, একবার সুন্দরবনের ধামাখালিতে, অন্য একবার রানাঘাটে। আকাশবাণীর নিয়মিত বক্তা ছিলেন তিনি। অন্তর ঢেলে অনুষ্ঠান করতেন। আশ্চর্য সুন্দর ছিল তাঁর বাচনভঙ্গি এবং উচ্চারণ। যুক্তি দিয়ে সহজ ভাষায় বোঝাতেন। ১৯৯৫ সালের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় আকাশবাণী গ্রহণের ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা করেছিল। আমি তখন আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগে ছিলাম। মনে আছে কী সুন্দর ভাষা-চিত্র এঁকেছিলেন। ক্রীড়া ভাষ্যকার অজয় বসু যেমন কথাতেই পুরো মাঠ এঁকে দিতে পারতেন ছবির মত, অমলেন্দুদাও গ্রহণের ক্রমপরিবর্তনশীল ছবি ও সেই সঙ্গে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন বর্ণনা করেছিলেন অনবদ্য ভাবে। উনি সর্বত্র বলতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র এক নয়। জ্যোতিষ বিদ্যা আদৌ কোনো বিজ্ঞানই নয়। অমলেন্দুদা কয়েকটি বইও লিখেছিলেন এই বিষয়ে। আমাদের বিজ্ঞান আন্দোলন যেটুকু হয়েছে তাতে ওঁর অবদান অনেকটাই। আমার সামান্য শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে মহাকাশ বিজ্ঞানী নারায়ণচন্দ্র রানা এবং তাঁর স্কুল জীবনের শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ির জীবন আধারিত ‘পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ’ অমলেন্দুদাকে উৎসর্গ করেছিলাম।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকার-নির্ধারিত পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়নি। বিজ্ঞান-সম্পর্কিত লেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কারও নয়। তথাপি তিনি অমলেন্দু। অমন অমলিন।

উমা

নব ১২

আসুন, কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি
পঞ্চম জর্জের সপিণ্ডীকরণ

আশীষ লাহিড়ী

বয়স বাড়ার একটা লক্ষণ, নিজের কথা বলতে চাওয়া। আমার বয়স হয়েছে, তাই আমি নিজের কথা বলব ঠিক করেছি। কারো বারণ শুনব না।

লাহিড়ীরা বামুন। আর বামুন হলেই পৈতে হয়। আমারও হয়েছিল। কিন্তু সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড। নিয়ম হচ্ছে বারো/তেরো বছরের মধ্যে পৈতে দিতে হয়। তখনও ছেলেরা আপনা থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করতে বাধ্য। তার পর পৈতে দিলে, যখন তাদের মাথায় কুচিন্তা ঢুকে গেছে, সে-পৈতে আর শুদ্ধ থাকে না। কিন্তু আমার জীবনে সবকিছুই উলটো। আমার বারো বছর বয়সে বাবা-মা আর ছোটো ভাই আমাকে কাকাদের কাছে রেখে বিদেশ চলে গেলেন, বিদেশ গেলে পাছে আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। আমি মনের আনন্দে কাকাদের প্রশ্রয়ে গান শুনে আর ক্রিকেট খেলে সময়টার সদ্ব্যবহার করলাম। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেল। বাবা-মা-ভাই বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। ততদিনে আমি আর বাধ্যতামূলক ব্রহ্মচারী নেই, মাথায় কুচিন্তা ঢুকে গেছে। তা হোক, তবু বামুনের ছেলের পৈতে হবে না! বাবা এসব ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলেন।

তখন আমি বুঝলাম হিন্দুধর্মের মহিমা। ফেলো কড়ি মাখো তেল-এর উপযোগিতা হিন্দুরা যেভাবে বুঝেছে, এমন আর কেউ কি আছে? (অবশ্য শুনেছি মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ নাকি টাকার বিনিময়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বেচত।) মূল্য ধরে হিন্দুধর্মে সব হয়। হালকা গোঁফদাড়ি-গজানো কিশোরকেও 'ব্রহ্মচারী' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। তাই হল। শুধু তাই নয়, আমি জেদ ধরলাম, ন্যাড়া-ট্যারা হতে পারব না। তাই সই। সতেরো প্লাস বয়সে একমাথা চুল নিয়ে আমার পৈতে হল। আমার আরও জেদ, পৈতের দিন আমি কষা মাংস খাব। মা তাতেই রাজি। মূল্য ধরে দেওয়া আছে না?

শুরু হল অনুষ্ঠান। যাঁরা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাননি, সেইসব হতভাগ্যদের জ্ঞাতার্থে জানাই, পৈতের সময় পুরোহিত মন্ত্র পড়েন, আর 'আচার্য' বলে নির্বাচিত কোনো ব্রাহ্মণ খুব মৃদুকণ্ঠে হবু-ব্রাহ্মণের কানে সে-মন্ত্র রিলে করে দেন। সেটা আর কেউ শুনতে পায় না। আমার আচার্য হয়েছিলেন আমার কাকা (সমীরকুমার), যাঁর চেয়ে রসিক লোক আমি আমার জীবনে বেশি দেখিনি। শ্বেতশ্মশ্রু বয়োজ্যেষ্ঠ ঠাকুরমশাই শুদ্ধ উচ্চারণে একটা একটা করে মন্ত্র পড়ছেন, আর আমার কাকা সেটি ফিসফিস করে আমার কানে চালান করে দিচ্ছেন। প্রথম মন্ত্রটির কাকা-কৃত রিলে এইরকম : নিউ রয়্যালে মাটন বিরিয়ানির সঙ্গে মাটন কিমার একটা থকথকে ঝোল দেয়, সেটা মেখে খেয়েছিস? বেদম হাসি কোনোক্রমে সামলালাম। কাকা ভালো অভিনেতা ছিলেন, তাঁর গম্ভীর প্রসন্ন মন্ত্রমুগ্ধ মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই; কিন্তু আমার অবস্থা টাইট। পরের মন্ত্র। কাকা কানে কানে বললেন, দিলখুশার কবিরাজিটা আজকাল আর আগের মতো ভালো করছে কিনা, খোঁজ করতে হবে। পরের বার মিত্র কাফে। আমার শরীর হাসি চাপতে গিয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এমনি করে মন্ত্রবলে কলকাতার রেস্টুরেন্ট-জগতের একটা কন্ডাক্টেড টুর সারলেন কাকা। আমার অবস্থা সঙ্গিন। অবশেষে পৈতে শেষ। আমি দ্বিজ।

এই ঘটনাটা নিয়ে পরে বেধড়ক মজা করেছি আমরা। তারপর যখন যুক্তিবাদ-টুক্তিবাদ মাথায় ঢুকল, তখন বেশ গর্বই হল : কেমন বামনাইয়ের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি!

তার চল্লিশ বছর পরে হাতে এল রাজশেখর বড়দা শশিশেখর বসু (১৮৭৪-১৯৫৪)-র 'যা দেখেছি যা শুনেছি'

(মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১৩৬২), ২০০৫ সংস্করণ। তখনকার দিনের এন্ট্রান্স পাশ লোক, সারা জীবন পড়াশোনা আর ইংরিজি সাংবাদিকতা করে কাটিয়েছেন। আটাত্তর বছর বয়সে পরিমল গোস্বামীর উপরোধে বাংলা লেখেন। সে-লেখা পড়ে মুজতবা আলী নাকি বলেছিলেন, 'এ লোকটা যদি আগে বাজারে নাবত ত কোথায় যেত রাজশেখর বোস, আর সৈয়দ মুজতবা আলী নর্দমায় গড়াগড়ি খেত।' শশিশেখরের ভাই রাজশেখরের দৌহিত্র দীপকংর বসু তাঁর একটি অনবদ্য চরিত্রচিত্র এঁকেছেন। তা থেকে যা জানলাম, তাতে মনে হল, আমার মেজোকাকা এঁর কাছে শিশু, কিন্তু ইনিই কাকার মহাজন।

শশিশেখরের অজস্র মজাকীর্ণ জীবন থেকে কেবল দু তিনটি এপিসোড তুলে দিলেই আমার কথার মর্মার্থ পরিষ্কার হবে।

এপিসোড ১ : কী এক অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁদের কুলপুরোহিত নবকুমার ভট্টাচার্যকে 'চামচিকে' বলে ডাকতেন। এই নাম গোটা পরিবার মেনে নিয়েছিলেন, এমনকী রাজশেখর বসুও। এই পুরোহিত সংস্কৃত 'ধূপদীপৌ' উচ্চারণ করতে পারতেন না, বলতেন 'যুবতী ঔ'। শশিশেখরের বাল্যকালে তিনি 'অতীব স্নেহভরে' শশীর 'পিঠে হাত বুলিয়ে উপদেশের অমৃত বর্ষণ শুরু করলেন — বাবা শশী, পিতা এত করে বলছেন, একটু ধম্মেকম্মে মন দাও। বাপের সুপুত্তুর হলে মঙ্গল হয়, এই দেখ, শ্রীরামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনবাসে পর্যন্ত গিছিলেন ...।' বালক শশীর সপাট উত্তর : 'খুব করেছিলেন, চোদ্দো বচ্ছর বনবাস, ভ্যাগাবন্ড, খাওয়া নেই, গায়ে জামা নেই, বউ গেল চুরি ...।'

এপিসোড ২ : '১৯১২এ পিতৃবিয়োগের পর শ্রাদ্ধে বসেছেন জ্যেষ্ঠপুত্র। — এটা সেটা সাজাতে দেরি হচ্ছে, [শশিশেখর] শ্রাদ্ধাসনে বসেই ভুজ্যির একটা কলা তুলে খেতে লাগলেন। — ছি ছি একি কাণ্ড — চামচিকের আর্তনাদ — প্রাচিত্তির করতে হবে। কি সব ''কদলী ভক্ষিষ্যামি ...'' ইত্যাদি বলে প্রাচিত্তির করেই — এবার একটা মণ্ডা তুলে খেতে লাগলেন। যতশীঘ্র সম্ভব শ্রাদ্ধ আরম্ভ হল।'

এপিসোড ৩ : তবে সবার উপরে তাঁর পঞ্চম জর্জকে পিণ্ডদানের গল্প। ১৯৩৬/৩৭ সাল। 'গয়ায় গেছেন শশিশেখর। পিতা এবং ১৯৩১-এ প্রয়াতা মাতার উদ্দেশে পিণ্ড দেবেন। নিয়মানুযায়ী সব সম্পাদন করে উর্ধ্বতন সপ্তম ... চতুর্দশ সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদানের পরেও অনেকটা উদ্বৃত্ত। আর কারংর নাম বলুন। তাও হল, তাছাড়া 'জাত-অজাত-কুজাত-বজ্জাত'ও কেউ বাদ পড়লেন না। তবু কিছু পিণ্ড বাকী। এবার শশিশেখরের শেষ নাম — জর্জ দ্য ফিফ্থ! — আরে ছি ছি, সে তো ম্লেচ্ছ! নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আর্তি — তাতে কি হয়েছে, আমি দেব। দিলেনও।' জর্জ দ্য ফিফথ মারা গিয়েছিলেন ১৯৩৬ সালে, ব্যাপারটা তখনও বেশ টাটকা। রাজশেখর বসুর 'জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মজা ছিল — দাদা জর্জ দ্য ফিফথএর পিণ্ডি দিয়েছে।'

আশ্চর্যর ব্যাপার হচ্ছে, এই লোকটি জীবনের এক দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন আর্যাবর্তে। কুম্ভমেলার সময় একটি বৃহৎ 'ভ্যাগা পার্টি' নিয়ে এলাহাবাদের নদীতীরে জিলাবি, কচৌড়ি, রাবড়ি ভক্ষণ আর মজা কুড়োনো তাঁর নেশা ছিল। আন্দাজ ১৮৯০ নাগাদ কুম্ভমেলায় একেকটি পাপ-পিছু শীতের গঙ্গায় একেক বুড়কি (ডুব) আর পুরোহিতকে একটি করে টাকা দিয়ে পাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। একটি লোক পাঁচটি 'বুড়কি' দিয়ে পাঁচটি টাকার বিনিময়ে পাঁচটি পাপ হালকা করে চলে গেল। খানিক পরে তার খেয়াল হল, সে তো একটি পাপের কথা চেপে গেছে। ছুটে গিয়ে 'পণ্ডৎ জি'-কে বলল, 'হম কলকাত্তাকে হামেদিয়া হোটল মে সিককাবাব ভোজন কিয়া।' পণ্ডিতজী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেতনা সিককাবাব খায়া থা?' — 'ছ হি ইঞ্চ (মাত্র ছ ইঞ্চি)।' এ তো মেগাপাপ। পণ্ডিতজী কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'ছ হি রুপিয়া দেও। বুড়কি মারো! আওর এক বুড়কি — ছ বুড়কি মারো।' ছয় বুড়কি দিয়ে তবে পাপীর পাপ খালাস হল। এবার সে হালকা মনে বলতে বলতে চলল, 'আওর পাপ নেহি করেঙ্গে। সড়ক মে কৈ ঝুলনীওয়ালী বাঁকা ছুকুরিয়া দেখেঙ্গে তো শূয়ার কি বাচ্চী কো হালাল কর দুংগা।'

ছোটোবেলায় আমরা থাকতাম সুকিয়া স্ট্রীটে। শশিশেখর থাকতেন আড়াই মিনিট দূরে মানিকতলার ঘড়িওলা বাজারের দোতলায় একটি ভাড়াবাড়িতে। আমার কাকার সঙ্গে তাঁর কি কখনো দেখা হয়েছিল? নিছক মজার টানে, 'অবিরাম দুষ্টবুদ্ধির তাড়নায়' এঁরা যা করেছিলেন, তাকেই গম্ভীর ভাষায় বলে নাশকতা। ধর্মাচরণের সমস্ত ব্যাপারটা যে দাঁড়িয়ে আছে ফক্কিকারির ওপর, সেটা ফাঁস করার এই পদ্ধতিই বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা।

এঁরা কেউ বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু এঁদের যেটা ছিল তা হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞান, যেটা না থাকলে বিপ্লব-টিপ্লব কিছুই হয় না।

উমা

বিদ্যাসাগর কি সত্যিই আস্তিক ছিলেন?

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বিদ্যাসাগর যে প্রকাশ্যে নিজের ধর্মমতের কথা বলতেন না — এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাঁর বইপত্রে কোথাও কোথাও ঈশ্বর বা জগদীশ্বরের নাম আছে — প্রথম থেকেই ছিল, পরেও রয়েছে — এ কথাও ঠিক। আবার *বোধোদয়*-এ প্রথম দিকের সংস্করণে ঈশ্বর-এর কথা থাকলেও সম্ভবত পঞ্চম সংস্করণ থেকেই যে সে-নাম বাদ পড়েছিল — হালে তা আবিষ্কার হয়েছে। (রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০১৯, পৃ. ২৩) কিন্তু শেষের দিকের কোনো সংস্করণে আবার যে ঈশ্বর নিয়ে একটি আলাদা নিবেশ (*এনট্রি*) যোগ হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এত পরস্পরবিরোধী তথ্য তাঁর সম্পর্কে রয়েছে যে এককথায়, অন্তত তাঁর ধর্ম-চিন্তার বিষয়ে, কোনো নির্দিষ্ট মত দেওয়া অসম্ভব। স্মৃতিকথার ওপর ভরসা করে লাভ নেই, এক-একজন একএকরকম বলেন।

এখানে পুরো বিষয়টি অন্যভাবে দেখা যাক। বিদ্যাসাগরকে যাঁরা আস্তিক বলে মনে করেন তাঁদের যুক্তি কতটা টেঁকসই — সেটিই আমরা বিচার করব। যদি যথেষ্ট টেঁকসই না হয়, তাহলেও কিন্তু প্রমাণ হবে না যে বিদ্যাসাগর নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু *ঐ যুক্তিগুলির ভিত্তিতে* তাঁকে আস্তিক বলে ধরারও কোনো কারণ থাকবে না।

প্রথম যুক্তি

বিদ্যাসাগরের আস্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তাঁর জীবনীকার, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি নিজে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর বিদ্যাসাগরকেও একেশ্বরবাদী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী আস্তিকরাও আর নতুন কোনো যুক্তি বা তথ্য দিতে পারেন নি। অতএব, চণ্ডীচরণের কথাগুলোই আমরা এক-এক করে বিচার করব।

অধ্যায় ১৩-র গোড়াতেই চণ্ডীচরণ স্বীকার করেছেন : 'সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার নিত্য জীবনের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকলাপসমগ্র আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না, অপর দিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের লক্ষণের পরিচয়ও কখন পাওয়া যায় নাই'। (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৫) কিন্তু, তাঁর মতে, একদা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মতভেদ ইত্যাদি দেখে তিনি আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে থাকেন নি। চণ্ডীচরণকে তিনি বলেছিলেন, 'এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি, তবে ঐ পথে না চলিয়া এ পথে চলিলে, নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, আর লোককে তাহা বুঝাইবার চেষ্টাও করি না' (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৫)।

এর পরে চণ্ডীচরণ একটি গল্প বলেছেন। তাঁর দাবি 'আমরা স্বর্গীয় [বিজয়কৃষ্ণ] গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এ-বৃত্তান্তটি শুনিয়াছি' (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৬, টী. ১)। বৃত্তান্তটির সারকথা এই : বোধোদয়-এর প্রথম দিকের কোনো সংস্করণে : ঈশ্বর প্রসঙ্গ ছিল না, পরে আসে।

কথাটি ডাহা ভুল। *বোধোদয়*-এর অন্তত প্রথম দুটি সংস্করণে গোড়াতেই ছিল : 'ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ'। পরে, সম্ভবত পঞ্চন সংস্করণে, 'ঈশ্বর' নাম উঠে যায়, থাকে শুধু 'পদার্থ', তার পরেই 'চেতন পদার্থ'। নবম সংস্করণে তা-ই আছে (বিশদ বিবরণের জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০২০ পৃ. ১৩-১৪ দ্র.)। এর বহু পরে যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ ফিরে এসেছিল, তাও ঘটনা। এখনকার প্রচলিত রচনাবলিতে প্রথম দুটি নিবেশ এইরকম: শুরুতেই আসে 'পদার্থ', তারপরে 'ঈশ্বর'। ঈশ্বর সম্পর্কে গোড়াতেই বলা থাকে : 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ'। চণ্ডীচরণের মতে, 'বোধোদয়ের মতই তাঁহার ধর্মমত' (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৬)। এটিও ভুল কারণ *বোধোদয়*-এর আদর্শ ছিল দুই চেম্বার্স্-রচিত *দ রুডিমেন্টস অফ নলেজ*। ইন্টারনেট-এ সেটি পাওয়া যায়। সেখানেই 'গড অ্যান্ড হিজ ক্রিয়েশন' শীর্ষক নিবেশটিতে লেখা আছে 'গড ইজ স্পিরিট অ্যান্ড ইজ ইনভিসিবল।' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর এখানে অনুবাদকমাত্র। তাঁর নিজের মত এমন হলে এক সময়ে তিনি সেটি তুলে দিতেন না।

দ্বিতীয় যুক্তি

বিদ্যাসাগর প্রায় সব চিঠির মাথাতেই 'শ্রীহরিঃ শরণম্'

লিখতেন (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৭)। চণ্ডীচরণকে অনুসরণ করে বিনয় ঘোষ দাবি করেছেন : বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ কি নেহাতই লোকাচর রক্ষার জন্যে এমন কাজ করতে পারেন? (১৯৭৩, পৃ. ৩৮১)

এ যুক্তি খুব একটা টেঁকসই নয়। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন — আশা করি সে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। তিনিও কিন্তু 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ' বা 'একা প্রভুই জানেন' কথাটি ব্যবহার করতেন (১৯৮৪, পৃ. ১৪৭, ১৯০)। তাঁর বিবেচনায়, এ ধরণের উক্তি নিছকই লব্জ, ঈশ্বরে বিশ্বাস করার মতো অজ্ঞ নন, এমন লোকও কথাটি ব্যবহার করে থাকেন (১৯৮৩, পৃ. ৮৬)। লোকমুখে চালু আছে যে, মার্কসও একবার বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি ''মার্কসবাদী'' নই।' এটি অবশ্য অপপ্রচার। ফরাসি মার্কসবাদীদের ওপর বিরক্ত হয়ে মার্কস একবার বলেছিলেন : 'আমি যা জানি তা এই যে আমি মার্কসবাদী নই।' (মার্কস-এঙ্গেলস ১৯৬৫, পৃ. ৪১৫)।

অর্থাৎ, এ ধরণের কথার সঙ্গে বক্তার আস্তিক্য-নাস্তিক্যর কোনো সম্পর্ক নেই। চিঠির মাথায় হরিশরণ নেওয়া একই ধরণের ব্যাপার। বিদ্যাসাগর কোনো মন্দিরে যেতেন না, তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো-কালীপুজো ইত্যাদি হতো না — এ-ই সত্যি।

তৃতীয় যুক্তি

অখিলদ্দিন নামে এক অন্ধ ও খঞ্জ ফকিরের গান শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেলতেন (ফকিরটি অবশ্য বলেছেন, '—'বিদ্দেসাগরবাবু ... এই গান শুনিয়া খুব খুসী হইতেন'); শুধু চণ্ডীচরণ (১৩৯৪ ব. পৃ. ৪৬৯) নন, ব্রায়ান এ. হ্যাচার ও আরও কেউ কেউ ঘটনাটির উল্লেখ করেন। কিন্তু একটুও ধর্মবিশ্বাস না-থাকলেও ধর্মীয় গান শুনে ভাবপ্রবণ মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে চোখের জল ফেলেন। *জীবনস্মৃতি*-তে, সম্ভবত অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী সম্পর্কে, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই লিখেছেন : 'জ্ঞানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আস্থাই ছিল না, অথচ শ্যামাবিষয়ক গান করিতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত'। (*র-র* ১১, ১৯৮৯ পৃ. ৬৩)

আর বিদ্যাসাগরের 'রোদনপ্রবণতা' তো সকলেরই জানা। শিবনাথ শাস্ত্রী থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অবধি অনেকেই তার সাক্ষী। ধর্মীয় গান শুনে অভিভূত হওয়া সর্বদা ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ নয়।

লেখার গোড়াতেই বলা হয়েছে, এই সব খণ্ডন দিয়ে বিদ্যাসাগরের নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু যে-সব যুক্তির ভিত্তিতে তাঁকে গভীর আস্তিক বলে দাবি করা হয়, সেগুলির অন্য ব্যাখ্যাও সম্ভব।

রচনাপঞ্জি

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *বিদ্যাসাগর*। কলেজ স্ট্রীট প্রকাশন, ১৩৯৪ ব.।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *জীবনস্মৃতি*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ১১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৯।

রামকৃষ্ণ ভট্টচার্য, নিরীশ্বর বোধোদয়, *উৎস মানুষ*, ১৪/১, ২০২০, পৃ. ১৩।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। বোধোদয়-এর ঈশ্বর প্রসঙ্গ। *সময়ের ঘড়ি*, শারদ ২০১৯। পৃ ২৩-২৬।

Lenin, V.I. *Collected Works*, Vol. 38. Moscow Progress
Publishers 1984.

Lenin, V.I. *Lenin on Language*. Moscow Raduga Publishers, 1983.

Marx, Karl and Frederick Engels. *Selected Correspondence*, Moscow : Progress Publishers. 1965.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : পার্থসারথি মিত্র

উমা

৩ পাতার পর

গণবিজ্ঞান আলোচনা সভায়, নারায়ণপুর ক্রীড়া উৎসব সমিতির সর্বজনীন সমবায় প্রীতিভোজন অনুষ্ঠানে পেয়েছি। উত্তর রাজাপুর চাষ-মই দেয়া ক্রীড়াভূমিতে অশোকবাবু এসেছিলেন। সারাদিন ক্রীড়া অনুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার প্রাক-মুহূর্তে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কলকাতা স্টেডিয়ামের স্পোর্টস ও আপনাদের পাড়াগাঁয়ের চাষ-মই দেয়া মাঠে স্পোর্টস — এ দুয়ের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত।' প্রতিযোগী ছেলেমেয়ে যদি প্রাইজ না পায় তা হলে বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে সবার মন খারাপ হয়। আর এখানে দেখি বাবা-মার সাথে যে হারে সে-ও হাসে, যে জেতে সে-ও হাসে।

পরিশেষে বলি, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা উৎসমানুষ জানুয়ারি-মার্চ ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম লেখাটি হল ডা: ভবানীপ্রসাদ সাহুর 'জাত পাত মুছে দৃষ্টান্ত খাপ-পঞ্চায়েত'।

দ্বিতীয় লেখাটি হল কৌতূহলী বিজ্ঞান সংস্থা, চুঁচুড়ার নতুন সামাজিক ডিজের সম্পর্কে প্রতিবেদন। আদর্শ স্থানীয় প্রতিবাদী কর্মোদ্যোগের প্রতিবেদনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

উৎস মানুষ পাঠচক্র, হরিণঘাটা।

উমা

ঝড়ের কলকাতা/ কলকাতায় ঝড়

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

[আদতে আবহবিজ্ঞানী হলেও চারদিকের ঘটনা নিয়ে অত্যন্ত সজাগ। বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজ সচেতন, যুক্তিবাদের পক্ষে বলেই উৎস মানুষ টিকে থাকুক তা মনে প্রাণে চান। অতি প্রবীণ মানুষটি নানান বিষয়ে উৎস মানুষকে লেখা দিয়ে সাহায্য করেন। লেখকের পরামর্শে উৎস মানুষ সাহস করে আবহাওয়া নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল।]

এবার একটা সাইক্লোন এসে কলকাতার ওপর তাণ্ডব চালিয়ে শহুরে বাবুদের হতচকিত করে দিল। প্রলয়ংকর ঝড় আর তুমুল বৃষ্টি একসঙ্গে মিলে যে প্রচণ্ড দুর্যোগ তৈরি করেছিল তা কলকাতার ইতিহাসে বিরল। বয়স্করাও বলল 'বাপের জন্মে' এরকম ঝড় কেউ দেখে নি। সংবাদমাধ্যম গেল ইতিহাস খুঁড়ে বার করতে, এই কি প্রথম? বেশি খুঁড়তে হল না কারণ পুরোনো কলকাতার সব ইতিহাসেই দেখা গেল, না এটা প্রথম নয়, এর আগে অন্তত আরও দু'বার কলকাতা এ জাতীয় ঝড়ে তছনছ হয়েছিল। প্রথমটা আজ থেকে ২৫০ বছরেরও বেশি আগে ১৭৩৭ সালে, দ্বিতীয়টি ১৫০ বছরের কিছু আগে ১৮৬৪ সালে।

এ দু'টি সাইক্লোন প্রচারের আলোয় এসেছে বন্দর কলকাতার ওপর এদের প্রচণ্ডতা থেকে। আর সেই প্রচণ্ডতা আবার হুগলি নদী বয়ে আসা সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাস থেকে। কলকাতা বন্দর ও সেখানে নোঙর করা পণ্যবাহী জাহাজদের ক্ষতি ছিল ব্রিটিশ রাজের বাণিজ্যিক স্বার্থের হানিকর। সাইক্লোন বলতেই আমাদের মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তা তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার আর প্রবল বৃষ্টি। এর প্রত্যেকটিই আলাদাভাবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কিছু কিছু, বিশেষ করে, বেশি শক্তিশালী সাইক্লোন সমুদ্র থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে বড় উঁচু একটা জলের পাহাড়। এ সব সাইক্লোন যখন ডাঙায় ওঠে তখন ওই জলের পাহাড়ও সে সঙ্গে উঠে পড়ে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গের বদ্বীপ অঞ্চলে এই পাহাড়ের উচ্চতা ৪০ ফুট পর্যন্ত হয়েছে।

এই বিশাল চলমান জলরাশির সামনে অতি শক্তপোক্ত ইমারত ছাড়া কোনো কিছু দাঁড়াতে পারে না। কুঁড়েঘর তো খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। যে সব সাইক্লোনে বিপুল লোকক্ষয় হয় তার প্রায় পুরোটাই হয় এই 'জলোচ্ছ্বাস' থেকেই। ডাঙায় উঠে এই পাহাড়টি তটরেখা থেকে মোটামুটি দশ কিলোমিটারের বেশি এগোতে পারে না। জমির সঙ্গে ঘর্ষণে তার বেগ কমতে থাকে আর জল চারপাশে ছড়িয়ে গিয়ে পাহাড়টার উচ্চতা ক্রমে কমতে থাকে। কিন্তু সাইক্লোন যেখানে ডাঙায় উঠছে সেখানে যদি কোনো নদী বা খাড়ির মোহানা থাকে তবে জলের পাহাড়টি সেই জলপথ বেয়ে অনেক দূর — একশরও বেশি কিমি. ভেতরে চলে আসতে পারে আর প্রায় একই রকমের তাণ্ডব চালাতে পারে। এ দুটি ঝড়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ভাগীরথীর মোহানার কাছে সাইক্লোন দুটি ডাঙায় ওঠায় জলের পাহাড়টি ভাগীরথী দিয়ে প্রায় বিনা বাধায় কলকাতা ছাড়িয়ে চলে এসেছিল। তাই এ দু'টি তার গতিপথের জনপদগুলোর ওপরে যে তাণ্ডব চালিয়েছিল তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল

কলকাতা বন্দরে তার ধ্বংসলীলা। আর আমাদের শিক্ষিত সমাজের শহরমুখিতার কারণে এ দু'টি এখন বহু চর্চিত বিশেষ করে, আশ্চর্যজনক ভাবে ১৭৩৭-এর ঝড়টি, যেটা সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা যায়।

কলকাতার ঝড় ১৭৩৭

১৭৩৭-এর সাইক্লোন বিখ্যাত হয়ে আছে দু'টি কারণে। লিখিত বিবরণ সামান্য হলেও পাওয়া যায় এমন সাইক্লোনগুলোর মধ্যে এটি প্রাচীনতম না হলেও প্রাচীনতমদের একটি। আর এ সাইক্লোনে নাকি তিন লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। প্রাণহানির নিরিখে এটি তাই বিশ্বের ভয়ালতম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি বলে গণ্য হয়েছে।

তবে এ ঝড় সম্বন্ধে অল্প যেটুকু জানা যায় তা সবই কলকাতা, তার চারপাশের অঞ্চল আর বন্দর সংক্রান্ত। ঝড়টিকে বঙ্গোপসাগর থেকে কলকাতায় পৌঁছতে যে সব অঞ্চলের ওপর দিয়ে আসতে হয়েছে সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কলকাতায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পঞ্চাশ বছর আগে একটি ঘাঁটি গেড়েছিল দিল্লীর বাদশাহী ফরমানের বলে। তখন কলকাতা আর তার চারপাশের অঞ্চল জুড়ে তার জমিদারি। লন্ডনে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো নিয়মমাফিক রিপোর্ট, আর কোম্পানিরই অভিজাত বংশীয় কর্মচারির দেশের বাড়িতে পাঠানো চিঠিতে সে রাতের অভিজ্ঞতা — এ দুটি থেকেই এ ঝড় সম্বন্ধে যা কিছু নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেছে।

ঝড় হয়েছিল ১১ অক্টোবর রাতে। ১৫ অক্টোবর তারিখে কোম্পানির সরকারি রিপোর্টে নথিবদ্ধ হয়েছে বিগত বিধ্বংসী ঝড় কোম্পানি বাহাদুরের সীমানার মধ্যে কালো মানুষদের বসতির এতটাই ক্ষতি করেছে যে পরের দিন মোটে কুড়িটার মতো কুঁড়েঘর দাঁড়িয়ে ছিল। আর সেই ঘরহারা মানুষগুলো সামান্য সম্বলটুকু খুইয়ে খাজনা দেবার মতো অবস্থায় ছিল না। দুর্যোগে আরও ইন্ধন যুগিয়েছে হাওয়ার তীব্র বেগ, তার জেরে নদীর জল এতটাই উপচে এসেছে যে প্রচুর পরিমাণে বাড়ির চাল নষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় তিন হাজার অধিবাসী আর বহুসংখ্যায় গৃহপালিত গবাদি পশু, ছাগল ও হাঁস মুরগি মারা গিয়েছে।

কোম্পানির সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্মচারিটি ঝড়ের প্রায় তিন মাস পরে দেশের বাড়িতে চিঠিতে লিখেছিলেন : 'সে রাতের মতো ভয়াবহ দৃশ্য আমি দেখিনি বা শুনিনি। সবচেয়ে তীব্র বাজের আওয়াজের মতো ভীতিপ্রদ দমকা হাওয়া আর মুষলধারার বৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে আমার বসত বাড়িটা, এ শহরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে শক্তপোক্ত যে কোনো মুহূর্তে আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়বে। আওয়াজ এত প্রচণ্ড হচ্ছিল যে আমি সপরিবারে নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। হায় ভগবান সকালে শহরের আর নদীর সে কি চেহারা! যেখানে আগের সন্ধ্যেয় নদীতে ছোট বড় ২৯টা জাহাজ ছিল সেখানে মোটে একটা দেখা যাচ্ছিল। বাকিগুলোকে ডাঙায় আছড়ে ফেলেছিল। কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভাঙল বাকিগুলো দুমড়ে গেল। এক মাইলের কম চওড়া নদীতে চব্বিশ ঘণ্টা কোনো ভাটা ছিল না। আমাদের চার্চের চূড়া ভেঙে নীচে পড়ে ছিল, যেমনটি পড়ে ছিল ইংরেজদের আট/দশটি আর কালো ব্যবসায়ীদের বাড়ি। পুরো শহরটা মনে হচ্ছিল যেন কোনো শত্রু-বোমা বর্ষণ করেছে। এমন একটা ভয়ানক ধ্বংস এটা করেছে যা ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছিল না। আমাদের সব ছায়াঘেরা রাস্তাগুলো ন্যাড়া হয়ে গেছে যা আগামী কুড়ি বছরে আগের মতো হবে না।' (উমপুনের ধাক্কায় দক্ষিণ কলকাতার ও নিউটাউনের কতগুলি রাস্তার হাল তুলনীয়)

বিভিন্ন সূত্রে আরও কিছু বিবরণ এ ঝড় সম্বন্ধে পাওয়া যায় বটে তবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহজনক। এরকম একটি হচ্ছে তিন লক্ষ লোকের প্রাণহানি, যার কারণে সাইক্লোনটি তীব্রতমদের দলে জায়গা পেয়েছে। এরকম আর একটি বিবরণ থেকে এ ধারণা জন্মাতে থাকে যে দুর্যোগটি ছিল ভূকম্পন এবং এই বিপুল সংখ্যক প্রাণহানি ভূমিকম্পের জন্যই। গবেষণায় অবশ্য এ দুটি ধারণাই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ঘটনাটি যে ভূমিকম্প নয় তা প্রমাণ করেছেন আমেরিকার একজন বিশিষ্ট ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ (Bilham)। আর প্রাণহানিতেও তিন লক্ষ সংখ্যা যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত তা প্রমাণ হয়েছে আর একটি অনুসন্ধানে (Sen Sarma, 1996)। কলকাতার জনসংখ্যাই তখন ছিল ২০ হাজারের মতো। আর যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে সাইক্লোনটিকে বয়ে আসতে হয়েছিল সেকালে সেখানকার জনসংখ্যাও ছিল নগণ্য। সমসাময়িক বিবরণে অবশ্য সাইক্লোনের কারণে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাতে কত প্রাণহানি হয়েছিল সে উল্লেখ ছিল না। ঘটনাটি যে সাইক্লোন— দুর্ভিক্ষ তার প্রমাণ। শক্তিশালী সাইক্লোনে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এসে জমির উর্বরতা নষ্ট করে দেয়, কয়েক বছর ফসল ফলে না, খাদ্যাভাব দেখা দেয়। একটি শক্তিশালী সাইক্লোনের নির্ভুল পদচিহ্ন দুর্ভিক্ষ।

এরকম আরও কয়েকটি বিবরণের নমুনা : '৬ ঘণ্টায় ১৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছিল'। 'ঝড়ের তাণ্ডব নদী বেয়ে ৩০০ কিমি ঢুকে গিয়েছিল'। '২০০ ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। ইংরেজদের

চার্চের চূড়া মাটিতে আস্ত গেঁথে গিয়েছিল'। 'ছোট বড় বিভিন্ন ধরণ মিলিয়ে ২০ হাজার জলযান ভেসে গিয়েছিল'। 'ইংরেজদের ন'টা জাহাজের মধ্যে ৮টাই হারিয়ে গিয়েছিল, অধিকাংশ মাল্লারা ডুবে মরেছিল'। আবার অন্যত্র 'ইংরেজদের তিনটে জাহাজ ডাঙায় উঠে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, একটাকে খুঁজেই পাওয়া যায় নি'। '৬০ টনের বজরাগুলোকে গাছের মাথার ওপর দিয়ে ১০ কিমি উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল'। ' অসংখ্য পাখিকে নদীতে আছড়ে ফেলেছিল'। '৫০০ টনের দুটো ইংরেজদের জাহাজ নদী থেকে ৩০০ মিটার দূরের এক গ্রামে গিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, লোকজন ডুবে মরেছিল'। 'নদীতে ডাচদের ৪টে জাহাজের মধ্যে তিনটি মাঝিমাল্লা আর রসদ সহ হারিয়ে গিয়েছিল'।

কলকাতা সাইক্লোন ১৮৬৪

এ সাইক্লোনও অক্টোবরেই, ৫ তারিখে। কিন্তু ততদিনে কলকাতা পলাশীর ২০ বছর আগের সেই ৫০ বছরের পুরনো ছোট বাণিজ্য কেন্দ্রটি আর নেই। সিপাহী বিদ্রোহের পরপরই ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে এদেশে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছে। কলকাতা তখন ভারত জোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাই তার বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকার দু'দুটো কমিশন গঠন করে। একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার অন্যটি বৈজ্ঞানিক কারণের (Gastrell J.E. 1866)।

বৈজ্ঞানিক কমিশনের রিপোর্টটি একটি অসামান্য দলিল। সাইক্লোন প্রভাবিত অঞ্চলের প্রতিটি পরগনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালিয়ে তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা বলেছেন : ৫ অক্টোবরের সাইক্লোনে প্রাণহানি হয়েছিল প্রধানত জলোচ্ছ্বাস থেকে। ঝড়ের কারণে প্রাণহানি তেমন সংখ্যায় হয় নি, মাঝিমাল্লা ও আরও যারা নদীতে ছিল তারা ছাড়া। কিন্তু এদের সংখ্যাও জলোচ্ছ্বাসে যারা ভেসে গিয়েছিল আর বন্যায় ডুবে মরেছিল তাদের সঙ্গে তুলনাই হয় না। কিন্তু কিছু কিছু জেলায়, বিশেষ করে মেদিনীপুরে, তাৎক্ষণিক প্রাণহানি দুর্ভিক্ষে বা রোগে (কলেরা, বসন্ত, দাস্ত ইত্যাদি) মৃতদের সমান বা কম ছিল।

কলকাতার জনসাধারণ, সরকার ও তার স্থানীয় আধিকারিকরা তৎপরতার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোতে খাদ্য ও পরিষেবা পাঠানোয় দুর্ভিক্ষের চাপ কিছুদিনের মধ্যেই কমানো গিয়েছিল। কিন্তু পচতে থাকা ওপড়ানো গাছপালা, সৎকার না করা মৃতদেহ আর পশুর শব সপ্তাহের পর সপ্তাহ অঞ্চল জুড়ে পড়েছিল। বিষাক্ত খাদ্য আর দূষিত জলের সমস্যা অত দ্রুত সমাধানের চেষ্টা হয় নি। তাই ঝড়ে স্বজন আর সম্পত্তি হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বন্যাবিধ্বস্ত মানুষগুলোর কাছে, বন্যার থেকেও যা প্রাথমিকভাবে তাদের বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল, এগুলো বেশি প্রাণঘাতী হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ রিপোর্টে গুমাই বলে একটি পরগনার উল্লেখ আছে যেখানে ২৩ জনের জলে ডুবে মরা নথিভুক্ত ছিল, পরবর্তী রোগে মারা গিয়েছিল ৫২৬-এরও বেশি।

কলকাতায় ৪ তারিখ রাত ১০টা থেকে ৫ তারিখ দুপুর পর্যন্ত বৃষ্টি বেশ জোরেই আসছিল কিন্তু খুব একটা ভারী ছিল না। বেলা ১১টা/১২টা থেকে হাওয়ার তোড়ে গাছ পড়তে লাগল, চৌরঙ্গীর বাড়িগুলোতে মোটামুটি আড়ালের গাছগুলোও।

কলকাতার আর তার আশেপাশে ২ জন ইউরোপীয় আর ৪৭ জন স্থানীয় মানুষ সাইক্লোনে মারা গিয়েছিল, ১ জন ইউরোপীয় আর ১৫ জন স্থানীয় বেশ গুরুতরভাবেই আহত হয়েছিল। একশরও ওপরে ইটের দালান আর ১০ হাজারেরও বেশি টালির ছাদ দেওয়া কুঁড়েঘর মাটিতে মিশে গিয়েছিল। দুপুর থেকে পৌণে তিনটে পর্যন্ত ঝড়ের বেগ বাড়তে বাড়তে হাওয়া মাপার যন্ত্রটাকেই উড়িয়ে নিয়ে গেছিল। ঝড়ের বেগ অবশ্য তারপর দ্রুত কমতে লাগল, বিকেল সাড়ে চারটে/পাঁচটায় ঝড়ের বেগ এতটাই কমেছিল যে অনেক কৌতূহলী মানুষ সাহস করে ময়দান পেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে ঝড়ে জাহাজগুলোর হাল দেখতে গিয়েছিল।

৫ তারিখে বন্দরে ছিল ১৯৫টি জাহাজ। সে জায়গায় ৬ তারিখ সকালে ২৩টি ছিল অক্ষত, ৩৯টি ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু সামান্য, ৯৭টি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত আর ৩৬টি হয় পুরোপুরি হারিয়ে গিয়েছিল আর নয়তো এত মারাত্মক জখম যে মেরামতের অযোগ্য। পরিযায়ী কুলিদের দেশান্তরে নিয়ে যাবার ৬৬৫ টনের একটি জাহাজ মাঝিমাল্লা আর কুলিদের প্রায় সবাইকে নিয়ে ডুবে গিয়েছিল।

কয়েক মাস লেগেছিল শহর, শহরতলী আর বন্দরকে নতুন করে গড়ে তুলতে।

কলকাতার ঝড় ২০২০

গত মে মাসের ২০ তারিখ দুপুর আড়াইটে নাগাদ সাইক্লোন উমপুন বকখালির কাছে ডাঙায় ওঠে। ভেতরে ঢুকে যথারীতি দ্রুত শক্তি হারাতে থাকে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় সমুদ্র উপকূলের প্রায় ৩ লক্ষ লোককে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনা হয়েছিল, তার মধ্যে ২ লক্ষ উত্তর ২৪ পরগনার আর ৪০

হাজার সাগরদ্বীপ থেকে। তাই প্রাথমিক শঙ্কার তুলনায় প্রাণহানি অনেক কম হয়েছে, কিন্তু সাইক্লোনের অন্যান্য প্রভাব ব্যাপক আর মারাত্মক হয়েছে। ২ লক্ষ হেক্টর জমি ও ৮৮,০০০ হেক্টর ধানের ক্ষতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় মৃতের সংখ্যা সংবাদমাধ্যম অনুসারে কম করে ৮৬, অধিকাংশই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বা বাড়ি চাপা পড়ে। রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ কোটি টাকা আর সাইক্লোনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে রাজ্যের জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের ওপর। ১৫ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস তটরেখার কাছের এক বিরাট জনসংখ্যাকে প্লাবিত করেছিল। আর সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। প্লাবন সবচেয়ে বেশি হয়েছিল সুন্দরবনে সেখানে জলোচ্ছ্বাস ১৫ কিমি পর্যন্ত ভেতরে ঢুকেছিল। বাঁধ জলোচ্ছ্বাসকে আটকাতে পারে নি, সুন্দরবনের সব দ্বীপই প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। ঝড়ে হাওয়ার গতিবেগ ছিল একভাবে ১১২ কিমি/ঘণ্টা, আর এক এক ঝাপটায় ১৯০ কিমি/ঘণ্টা বেগে ঘরবাড়ি ভেঙে আর গাছ আর বিজলির থাম উপড়ে ফেলেছিল। কলকাতায় ১৩৩ কিমি/ঘণ্টার হাওয়া গাড়ি উল্টে, ১০,০০০ গাছ আর ৪০০০ বিজলির থাম উপড়ে ফেলেছিল। কলকাতার অধিকাংশ অঞ্চলে ২৪ ঘণ্টার ওপর বিজলি ছিল না। কলকাতায় মৃতের সংখ্যা ছিল কম করে ১৯ জন। ২৩৬ মিমি বৃষ্টিতে শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল।

কলকাতার ওপর প্রভাব নিয়ে বিচার করলে এ তিনটি সাইক্লোনের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া যায় বটে কিন্তু একটা মূল বিষয়ে, জলোচ্ছ্বাস, অমিল থেকেই যায়। অতীতের দু'টি সাইক্লোনের ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসও কলকাতায় ছিল। উমপুনে ছিল না। কলকাতা তাই জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব থেকে রক্ষা পেয়েছে। সুন্দরবন পায় নি। পাশ দিয়ে চলে যাওয়া আইলার ক্ষত ১০ বছর ধরে বহন করে তার থেকেও অনেক শক্তিশালী, সুন্দরবনেই আছড়ে পড়া, উমপুনের ক্ষয়ক্ষতি কতদিনে নিরাময় হবে, আদৌ হবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

উল্লেখপঞ্জী : ১) Bilham, R : The 1737 Calcutta Earthquake V Cyclone Evaluated. Bulletin Sismological Society of America, 84(5), 1994 ২) Gastrell J.E. and H.F. Blanford: Report of the Enquiry Commission on Calcutta Cyclone of 1864, 1866 ৩) SenSarma, Reconstructing the Great Bengal Cyclone of 1737, Mausam 1996.

সহায়ক আকর : SenSarma A.K. The Great Bengal Cyclone of 1737, an enquiry into the legend. Weather, 1993। সেনশর্মা, অঞ্জনকুমার : আইলা ও প্রশ্নের ঝড়, উৎস মানুষ, জানুয়ারি, ২০১০।

উমা

সুন্দরবন : ভূত-ভবিষ্যৎ

অমলেশ চৌধুরী

[এস ডি মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে বামনখালিতে দীর্ঘদিন ধরে পূর্ব বঙ্গোপসাগরে উপকূলবর্তী বনাঞ্চলে বিশেষ করে সুন্দরবন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে গবেষণার কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি গবেষণায় অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জ্ঞান সুন্দরবন উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পকে পুষ্ট করে চলেছে। যাঁদের তন্নিষ্ঠ প্রয়াসের কথা আমরা জানতে পারি না। সংস্থাটির সম্পাদক ও প্রাণপুরুষ অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী খুব অল্প সময়ে আমাদের বিশেষ অনুরোধে লেখাটি পাঠিয়েছেন। আজও এই নব্বই বছর বয়সে অধ্যাপক চৌধুরীর ধ্যান-জ্ঞান সুন্দরবন, সামুদ্রিক প্রাণীকুল ও তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে।]

সুন্দর বনানীর নামে সুন্দরবন — পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য, যা গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বৃহত্তম গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (গ্যাঞ্জেটিক ডেলটা) অঞ্চলের প্রায় পুরোটা জুড়ে। পৃথিবীর নবীনতম ভূখণ্ড যার বয়স ছয় থেকে সাত হাজার বছর মাত্র। ভূ-তত্ত্বের হিসেব মতো এই সময়কালের (হলোসিন এজ) শেষের সাত হাজার বছর সময়ে গঙ্গার 'শতধারা'য় পরিবাহিত পলি-নুড়ি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বয়ে আনা জোয়ারের জলের বালি সহযোগে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে এই বিশাল ব-দ্বীপ যার বিস্তৃতি— আজকের সুন্দরবনের সীমানা ছাড়িয়ে আরও উত্তরে কলকাতা-সল্টলেক-নিউটাউন, বারাসত-সোদপুর- ব্যারাকপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এক সময়ে সুন্দরবন বনানীর — স্থানীয় ভাষায় বাদাবনের বিস্তৃতিও ছিল এতদূর পর্যন্ত। ভারতীয় অংশের সুন্দরবন সমগ্র সুন্দরবন ব-দ্বীপের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। বৃহৎ দুই-তৃতীয়াংশ বাংলাদেশের খুলনার বাগেরহাট-সাতক্ষীরা, ফরিদপুরের কিয়দংশ ও বরিশালের পুরো নিম্নাংশ ও পূর্বে চাঁদপুর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রায় ১০ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে আমাদের সুন্দরবন পৃথিবীর ক্রান্তীয় বলয়ে দুই গোলার্দ্ধে যত ম্যানগ্রোভ বনানী আছে — আয়তনে ও জীব বৈচিত্র্যে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সৌভাগ্যক্রমে ইউনেসকো প্যারিস-এর সৌজন্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ক্রান্তীয় বলয়ে যত দেশে ম্যানগ্রোভ বনানী আছে, সেখানে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছিল ।

তুলনামূলকভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল ম্যানগ্রোভ বনানীর প্রজাতি বিন্যাস ও বনানী আশ্রিত হাজারো প্রজাতির প্রাণী সমাবেশ — এককথায় অপরূপ 'প্রজাতি বৈচিত্র্য'। সুন্দরবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর প্রাণীটি হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার যা পৃথিবীর আর কোনও ম্যানগ্রোভ বনানীতে নেই। মাত্র ২০০-৩০০ বছর আগেও অবিভক্ত সুন্দরবনে অনেক বন্য প্রাণীর সমাবেশ ছিল। যেমন দু-রকমের গণ্ডার, একশৃঙ্গ ভারতীয় গণ্ডার ছাড়াও ছিল ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপের 'জাভান রাইনোসেরাস', চার-পাঁচ প্রজাতির হরিণ, প্রচুর বুনো মহিষ ইত্যাদি। সুন্দরবনের জলের লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব অনেক প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটে। বহু প্রজাতির পাখি, মাছ, প্রজাপতি ও পতঙ্গের সমাবেশে সুন্দরী সুন্দরবন সদাই প্রাণচঞ্চল। বিশ্বসংস্থা ইউনেসকো ভারতীয় ও বাংলাদেশের সমগ্র সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। দুই বাংলার সুন্দরবনের অজস্র নদী নালায় যে বিশাল ঈষৎ লবণাক্ত জল ও অরণ্যের পরিবেশ (ওয়েটল্যান্ড), তাকে 'র‍্যামসার সাইট' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬১ সালে গবেষণার কাজে প্রথম বাস্তবের সুন্দরবনে ঢুকি কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে কাকদ্বীপ হয়ে মৌসুনি দ্বীপে। যেখান থেকে নৌকাযোগে সপ্তমুখী নদীতে লোথিয়ান ও প্রেন্টিস দ্বীপে যাওয়া যায়। গভীর ম্যানগ্রোভে গবেষণার কাজে কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরি হল মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি একটি গবেষক দল বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ মানুষদের নিয়ে। (বায়োলজি, জুলজি, বোটানি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়ো-কেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি এবং স্ট্যাসিটিক্স)। ইউনেসকো প্যারিস থেকে দু'জন বিজ্ঞানী এলেন সুন্দরবন দেখতে ১৯৭৫ সালে। সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্ট-এর সঙ্গে তখন আমার কাজ চলছে। টাইগার প্রজেক্ট-এর স্পিড বোট-এ করে ইউনেসকো বিজ্ঞানীদের সুন্দরবনের গভীরে অনেকটাই দেখানো সম্ভব হল। এরপরেই ১৯৭৬-এর জুলাই মাসে দিল্লীতে মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-র আমন্ত্রণে তিনদিনের ম্যারাথন মিটিং-এ ন্যাশনাল ম্যানগ্রোভ কমিটি গঠন করা হয় যার আমি ফাউন্ডার মেম্বার। ইউনেসকো-র ঐ দুই বিজ্ঞানী Dr. Mara Steyart এবং Mrs. Martha Vannueci ঐ তিন দিনের মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ড. কুমুদরঞ্জন নস্কর, ড. অধ্যাপক মঞ্জু ব্যানার্জী, ড. অধ্যাপক অমিতাভ ঘোষ, ড. সুনীতি মিশ্র, এঁদের দীর্ঘদিন সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ গবেষণার কাজে নিয়োজিত রাখতে পেরেছিলাম। আমাদের সম্মিলিত গবেষণার কাজ বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবন উন্নয়নে সরকারি ও অসরকারি প্রকল্প রূপায়নে সহায়ক হয়েছিল।

এবারে লোকারণ্যে সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেমন আছে সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করি। বন হাসিল করা অবিভক্ত সুন্দরবনে ১৯৩১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৭,৫৪,৪২১। ভারত এবং বঙ্গ বিভক্ত হওয়ার পরে ১৯৫১-তে ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ১১, ৫৯, ৫৫৯। ১৯৬১-তে জনসংখ্যা ছিল ১৪,৪৬,২৮২ আর আজ ১৯টি ব্লক নিয়ে যে সুন্দরবন দুই ২৪ পরগনায় তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ লক্ষের ওপর। ভারতীয় সুন্দরবনে ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫০টি দ্বীপে জনবসতি রয়েছে। আর ৫২টি দ্বীপ বনদপ্তরের অধীন, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাঘ্র প্রকল্প, বাফার জোন ও জাতীয় উদ্যান। লোথিয়ান দ্বীপের জাতীয় উদ্যানটিকে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দপ্তর ম্যানগ্রোভ জোন-পুল সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। লোকবসতি পূর্ণ সুন্দরবনকে আমি মূলত দুইভাগে ভাগ করি – 'আইল্যান্ড সুন্দরবন' এবং 'মেইন ল্যান্ড সুন্দরবন'। 'আইল্যান্ড সুন্দরবন'-এর অধিবাসীদের প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়। তাদের জলপথই একমাত্র যোগাযোগের সম্বল। 'মেইন ল্যান্ড সুন্দরবন'-এর সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ রেলপথে ও সড়কপথে। ব্রিটিশ আমলের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় থেকে লেখাপড়া, ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে দৈনিক জীবিকা নির্বাহ, আধুনিক চাষবাসের সুবিধা গ্রহণ ইত্যাদি সুযোগ ৮০-১০০ বছর আগে থেকেই মানুষজন পেয়ে আসছে।

করোনা অতিমারির মতো আইলা, বুলবুল বা আমপানের মারাত্মক আঘাত বারবার সুন্দরবনের ওপর (এপার ও ওপার বাংলা) আছড়ে পড়েছে। ফলে মাটির বাঁধের আড়ালে মাটির

ঘরবাড়ি মুখ থুবড়ে পরে বারেবারেই। আমপান বিধ্বংসী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনের ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও করে ওঠা যায় নি। গত ১০/১৫ বছরে দুই বাংলার সুন্দরবনে প্রচুর

রেসকিউ সেন্টার তৈরি হওয়ার ফলে এখন এই ধরনের মহাতাণ্ডবে প্রাণহানি প্রায় শূন্যে নামিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। গত ৩০/৩৫ বছরে পাকাবাড়ি করে নিয়েছেন অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা। প্রতিটি আইলা আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের জন্য কোটি কোটি টাকা অনুদান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আসতে শুরু করে। তখনই শুরু হয়ে যায় রাজনীতির খেলা অনুদান বণ্টন নিয়ে। শহর কলকাতার বহু অসরকারি সংস্থা, এনজিও গোষ্ঠী এবং বহু মিশন সন্ন্যাসীরা দুর্গতদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কিছুদিন পরেই আবার সব থিতিয়ে ঝিমিয়ে যায় পরের মহামারির অপেক্ষায়।

এখন চলছে বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগ, যা কয়েক হাজার বছর পর পর ফিরে আসে পৃথিবীতে। ফলে সমুদ্রে জলস্তর বাড়ে, জলস্ফীতি বাড়ে। প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। দুই মেরু প্রদেশেই বরফ গলতে থাকে। তাকে ঠেকানো মানুষের কম্ম নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ বাণী, ক্রান্তীয় বলয়ে পৃথিবীর অনেক দেশেই— ভারতের মুম্বাই, চেন্নাই, সৌরাষ্ট্র এবং কলকাতার উপকণ্ঠ (সুন্দরবন সমেত) আগামী ২০৫০ সালের কাছাকাছি জলপ্লাবনে ভেসে যেতে পারে। তবে ২১২০-২১২৫ সাল নাগাদ যে জলপ্লাবন হবে সেটা সম্ভবত 'মহাপ্লাবন'। তখন সমগ্র সুন্দরবন সহ বৃহত্তর কলকাতা, দমদম, বারাসত, ব্যারাকপুর পর্যন্ত প্লাবিত হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে ৬/৭ হাজার পর পর গ্ল্যাসিয়েশন-ডি-গ্ল্যাসিয়েশন-এর ফলে মেরুপ্রদেশের বরফ জমে ও গলে। প্রায় ৭০০০ বছর আগে যে ডি-গ্ল্যাসিয়েশন (হিমবাহের গলন) শুরু হয়েছিল তার মহাপ্লাবনে আমাদের গড়ে ওঠা নবীনতম ভূখণ্ড গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও তাতে গড়ে ওঠা নতুন সুন্দরবন সবটাই সমাধিস্থ হয়ে যায় পলি-বালিস্তূপের নীচে। সেই সময়কার ম্যানগ্রোভ, বেশিরভাগই সুন্দরী গাছের জীবাশ্ম আমরা আজও খুঁজে পাই শিয়ালদহ, দমদম, বসিরহাট-ব্যারাকপুর, বাংলাদেশের খুলনা-সাতক্ষীরার মাটির গভীরে ৫০/৬০ ফুট নীচে। মেট্রোরেল খোঁড়াখুঁড়ির সময় ১৯৮৪ সালে এখনকার চাঁদনিচক-এসপ্লানেড-এর সংযোগস্থলে প্রায় ৪০ ফুট মাটির নীচে একটি আস্ত দাঁড়ানো সুন্দরী গাছের ফসিল পাওয়া যায় (ড. মঞ্জু ব্যানার্জী, ১৯৮৫)।

ডি-গ্ল্যাসিয়েশন-এর জেরে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে ক্রমপর্যায়ে বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নিতে হবে (মাস পপুলেশন শিফটিং) এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এখনই। তবেই ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের ব্যাপক প্রাণহানি ঠেকানো যাবে। আমাদের রাজ্যে সমগ্র সুন্দরবনই শুধু নয় বৃহত্তর কলকাতা নগরী, সল্টলেক, নিউটাউন, দমদম, বারাসত, সোদপুর, ব্যারাকপুর, দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাট-জোকা সহ সব এলাকা থেকেই ক্রমপর্যায়ে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এই প্রকল্প অবশ্যই বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

উমা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

শিবাংশু মুখোপাধ্যায়

অজস্র এপিস্টেমোলজিকাল সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, রাজনৈতিক চাপান-উতোর সত্ত্বেও, বিজ্ঞান মানুষের জীবনে, বিবর্তনে ও সভ্যতার বিকাশে যে ভূমিকা পালন করে এসেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওরফে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স তার ছিটেফোঁটা তো করেই নি, বরং মানব সভ্যতায় সে বিজ্ঞানের উলটো কাজটা করেছে। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের যে সমস্ত নতুন নতুন দিক-পরিবর্তন এবং তার ফলশ্রুতিরূপে নানান প্রযুক্তির আবিষ্কার অর্থাৎ 'টেকনোলজি ফর ম্যানকাইন্ড' অথবা 'টেকনোলজি ফর ওয়ার' এবং সেই টেকনোলজির বাণিজ্যিকীকরণের সপক্ষে ও বিপক্ষে সবরকম যুক্তির কথা, অস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে আইনস্টাইন, মাদাম কুরিসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই বলছি — অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ এবং চলতি শতকে বিজ্ঞানের যে কোনো ডিসকোর্সের কথাই ভাবুন না কেন — তার কোনোটাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনো স্থান নেই। এমনকি এজ অফ ডিসকভারির সঙ্গেও এ যুগের মিল নেই। এ আসলে বিজ্ঞানের নামে, প্রযুক্তির নামে, এক বিরাট ভাঁওতামাত্র। কেন এত বড় অভিযোগ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিরুদ্ধে তুলছি, সেটা নিয়েই সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

যেমন, বর্তমান পৃথিবীর করোনা-কবলিত পরিস্থিতিতে বারবার উঠে আসছে সেই পুরোনো চাল ভাতে বাড়ার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকে রাষ্ট্রের আরও অনেক বেশি নজর দেওয়ার কথা। এই দুর্বিপাক থেকে মুক্তি দেওয়ার কোনো রাস্তা জানা নেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার, বিজ্ঞানের আছে। অথচ মানুষকে নানান আকর্ষণীয় ইলেকট্রনিক পণ্যের মাধ্যমে মোহবদ্ধ করে প্রতিনিয়ত তার জীবনের যে নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নিচ্ছে মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো, তা ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে। এবং মনে রাখতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের মন, মনের ইচ্ছে, কামনা, বাসনা, অভিজ্ঞতা ও সময়কে ব্যবহার করা হয় কাঁচামাল হিসেবে। সাধারণ মানুষ নিজের অজান্তেই বিনামূল্যে সেইসব উৎপাদনে রসদ যুগিয়ে চলে। ওদিকে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেই সব বড় বড় কোম্পানি এ দেশে যথেচ্ছ ব্যবসা করবার সুযোগও পেয়ে যাচ্ছে। পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মসংস্থানের কথা উঠলেই জিনিসটা আরও হাস্যকর শোনায়। জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৩৯.১% শতাংশ লোক 'কাজ করে'। 'কাজ করে'-র অর্থ সকলে অফিসে চাকরি করে এমন নয়। যেমন সেই ৩৯.১%-এর মধ্যে ৫৬.৬% লোক কেবল কৃষিকাজে নিযুক্ত। ওই লিস্টে তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করে কত জন — তার কোনো হিসেবই দেওয়া হয় নি। অথচ ওই তালিকায় — মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, কনস্ট্রাকশন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। 'আদার সার্ভিসেস'-এ দেখানো আছে ১০%। তাতে বোঝা যায়, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'-ভিত্তিক কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা নিশ্চয়ই হাতে গোনা। তথ্য প্রযুক্তিতে কাজ করা মানেই তো আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কর্মী নয়। সুতরাং কর্মসংস্থান হলেও সেটা ভারতের জনসংখ্যার সাপেক্ষে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর।

তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় বেশ কিছু মানুষ মজে আছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞানের তরফ থেকে নয়, দিতে হবে বাণিজ্যের তরফ থেকে। মানুষ নিজে যা পারে, একটা সামান্য যন্ত্র, সেই কাজের একটা অংশ করে দিতে পারছে দেখতে পেলে, মানুষ যারপরনাই খুশি হয়। খুশি হয়, এটা জানলে যে তাকে আর ব্যাংকে গিয়ে লাইন দিয়ে টাকা তোলা, জমা দেওয়া বা টাকা ট্রান্সফার করার মতো কাজ করতে হবে না। দোকানে, শপিং মলে না গিয়েও সে বাড়িতে বসে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে পারবে। এমনকি মুদিখানার বাজারও সে আজ বাড়িতে বসে করতে পারে। তার তো সময় কম। কেন কম সময়? সেই প্রশ্ন তাদের মনেও আসে না! ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উৎপাদন যন্ত্রে তারা তাদের পার্সোনাল তথ্য সরবরাহ করেন, সেই সঙ্গে করেন সময়ও।

ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এসে মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে — কথাটা আসলে নিজের উৎপাদনের কাজে সেই বাঁচানো সময়ের পুরোটাই কাজে লাগাবে বলে। খেয়াল রাখতে হবে মধ্যবিত্তের জীবনের সময় কমিয়ে আনার কাজটাও কিন্তু বিশ্বের নতুন বাণিজ্য-পদ্ধতির মাধ্যমেই করা হয়েছে। তার কর্মজীবনের

প্রকৃতিটাই আজ বদলে গেছে। ওদিকে নতুন পণ্যের প্রতি মোহও তো মানুষের আগ্রহ সর্বকালের। সুতরাং দুই-দুইয়ে চার করলেই দেখা যাবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি ঠিক নয়, নতুন নতুন আকর্ষণীয় ডিভাইসের স্বয়ংক্রিয়তায় মুগ্ধ হয়ে এবং বাজারজাত পণ্যের প্রতি মোহবদ্ধ হয়ে এবং সর্বোপরি ভোগের আদর্শে মজে গিয়েই মানুষ আজ প্রযুক্তির গুণগান গাইছে।

এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মোদ্দা কথাটা কী— তা কি জানেন? সমস্যা সমাধানের বা নতুন জিনিস শেখবার যে বুদ্ধি ঈক্ষা (ইন্টেলিজেন্স বা কগনিশন) মানুষের আছে তা নকল করে মেশিনকে অর্থাৎ কম্পিউটারকে শেখানো যাতে সেও মানুষের মতো বিভিন্ন বিষয় শিখে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে। এইটুকু বললেই সব বলা হল না কিন্তু। তবু তো একটা ধারণা পাওয়া গেল। গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজের ক্ষেত্র সম্বন্ধে যেমন আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে সেইসঙ্গে এও পরিষ্কার হবে যে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে মানুষকে সাহায্যের পরিবর্তে আসলে তার কাজের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করে তোলে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেই উঠে আসে অ্যালগরিদমের কথা। অ্যালগরিদম গাণিতিক পরিভাষা। অ্যালগরিদমের মানে যতটা সহজে অভিধান ঘেঁটে দেখে নেওয়া যায়, তার হিসেব কষা ততটা সহজ নয়। সেটা গণিতের মতোই শিখতে হয়। আমি সেই অঙ্ক কষা শিখি নি। তবে আভিধানিক মানে এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের লোকেদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি— অ্যালগরিদম আসলে সমস্যা সমাধানের জন্য নিয়মের কিছু বাঁধা গৎ বা সূত্র অনুসরণ করা। অ্যালগরিদম মূলত কম্পিউটারকে দিয়ে সমস্যা সমাধানের কাজ করায়। সমস্যা কার? সমস্যা মানুষের। সমস্যা তৈরি হল কীভাবে? সমস্যা তৈরি হল, নতুন বাণিজ্যনীতির মাধ্যমে। এখন মানুষকে বলতে শুনবেন, 'প্রযুক্তি এখন কত সুবিধা করে দিয়েছে, কত সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে আমাদের', কারণ ইলেকট্রিকের বিলটা পর্যন্ত অনলাইনে দেওয়া যায়।

এবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশ্নে যখন মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গ এসে পড়ে এবং খুব গুরুগম্ভীর আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয় যে রোবট আসল মানুষের সমতুল হয়ে মানবিক সমস্যার সমাধান করবে তখন খুব অবাক লাগে। মানুষের মন ও ঈক্ষা নিয়ে সারাজীবন কাজ করে সফল হয়েছেন সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়ের দুজন প্রথিতযশা মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক আগেই। তাঁদের একজন গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি যিনি ভাষার মাধ্যমে মানব-মস্তিষ্কের বিচারের কাজ করেছেন আর একজন বিখ্যাত গণিত ও পদার্থবিদ রজার পেনরোজ। তাঁর কাজও ফিজিক্স অব মাইন্ড অ্যান্ড কনসাস্‌নেস নিয়ে।

চমস্কি বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ দু-রকমভাবে হয়। এক ধরনের কাজের বিষয় হচ্ছে — কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার মডেলিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বায়োলজিকাল সিস্টেম আবিষ্কার করার চেষ্টা করে। যেমন, মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাও তো এক ধরনের বায়োলজিকাল সিস্টেম। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদির মতোই সাধারণ জ্ঞান হিসেবে কাজ করে। আর এক ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে --- যাকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে মানবসভ্যতায় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। যেমন, আমরা প্রতিনিয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ম্যাজিক দেখতে পাই। চমস্কি বলছেন— এই অ্যাপ্লিকেশন বানানোর খেলা আরও উন্নত হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে মানুষের কাজে তা কতটা লাগছে তার ওপর। কিন্তু বিজ্ঞান হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যত নিয়ে তিনি সন্দিহান। শুধু তাই নয়, বলছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানুষকে বুঝতে গেলে সেটা হবে ক্যাটস্ট্রফি। অথচ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনে করে মানুষের বুদ্ধিমত্তাও কতকগুলো সাধারণ নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ --- ব্যক্তিবিশেষের আচরণ হয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। মনে রাখতে হবে, চমস্কির ভাষাবিজ্ঞানের মৌলিক দাবিও কিন্তু তাই-ই। মানুষের ভাষাও তাঁর মতে কতকগুলো বিশ্বজনীন সূত্রে বাঁধা — যে সূত্রগুলো মানুষের জন্মগত। তিনিও মানুষের ভাষাকে বুঝতে বিশ্বজনীন ব্যাকরণের ওই সূত্রগুলোকেই কাজে লাগাতে চান। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে মানুষের ভাষায়-ভাষায় তফাতের প্যারামিটারগুলোকেও খেয়াল করতে বলেন।

কেন মানুষকে বুঝতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগবে না— তা সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পেনরোজ। তিনি বলেছেন, কম্পিউটার কোনো কিছু অভিজ্ঞতা থেকে পায় না। অ্যালগরিদমের মধ্যে দিয়ে কম্পিউটারকে কেবল একটা প্যাটার্ন চিনিয়ে দেওয়া যায়। ওই চিনিয়ে দেওয়াকেই মেশিন লার্নিং বলে। পেনরোজ দেখাচ্ছেন ৩×২ = ৬ যেমন হয়, তেমনই ২×৩ = ৬ হয়। এই যে ৩ আর ২-এর ক্রম উলটে দিলেও গুণফল একই থাকে, সেটা একটি শিশু এমনিই শিখে নিতে

পারে। এটাই তার সমস্যার সমাধান বিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তির সবচেয়ে বড় জায়গা। একটা নতুন প্যাটার্ন পেলে সে তার অন্যান্য অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সেই সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে নিতে পারে। কম্পিউটারের যেহেতু কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করার কোনো উপায় নেই, তাই তাকে দুটো ক্রমকেই চিনিয়ে দিতে হয়। এটা যে কোনো দুটো সংখ্যার ক্ষেত্রেই যে সত্যি, সেটাও সে বুঝতে পারে না। মানুষ শুধু নিয়মের বাঁধা গতের মধ্যে দিয়ে বা কেবলমাত্র যুক্তি দিয়ে কিছু শেখে না। তারা তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্যে আজ যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে জায়গা কিছুতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের সবকিছু অ্যালগরিদম নয়। মানুষের কনসাসনেসও কম্পিউটেশনাল নয়। কম্পিউটারকে দিয়ে মানুষের কাজ করাতে গেলে তাকে প্রতিটি আলাদা আলাদা বিষয়ের বা ঘটনার অজস্র তথ্য আগে থাকতেই চিনিয়ে বা শিখিয়ে রাখতে হয়। কারণ কম্পিউটার আপনার দেওয়া তথ্যের ওই বিপুল ভাণ্ডার থেকে সমাধান নিয়েই আপনাকে সাহায্য করবে। যে কারণে গুগল, মাইক্রোসফট, জেরক্স, আইবিএম ইত্যাদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এত সফল কাজ করতে পারে। কারণ তাদের দেওয়া অন্যান্য সস্তা বিনোদনের মাধ্যমে আপনি নিজের অজান্তেই নিরন্তর তাদের তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। বরং বলা চলে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কাজে লাগে না, ক্রেতা হিসেবে মানুষের চরিত্রের গড়পরতা প্রকৃতি বুঝতে ওই সমস্ত বহুজাতিক বাণিজ্য সংগঠনকেই সাহায্য করে। আপনার মন সেইসব সংগঠন বুঝে গিয়েই তো তারা পৃথিবীটার দখল নিতে চায়।

তবু রাষ্ট্রেরও এই একই প্রকল্পে পেটের দায়ে আমাকেও অংশ নিতে হয়। ওই যে 'সেট অফ রুল', প্যাটার্ন চিনিয়ে দেওয়ার কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লাগে, ভাষার ক্ষেত্রে ওই কাজই আমাকে করতে হয়। জনগণের কাছে রাষ্ট্রের ভাবটা সবসময় থাকে প্রজাদরদী রাজার মতো। প্রজা দরদের কথা তাই তাকে সব সময় মুখে আওড়ে যেতে হয়। যেমন, এই বাজেট তো জনগণের বাজেট, এই শিক্ষা তো জনগণের বিকাশেরই লক্ষ্যে, এই স্বাস্থ্য তো জনগণেরই স্বাস্থ্য। তেমনই রাষ্ট্র এও বলে, এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রসূত পরিষেবা সবই জনগণের কথা ভেবে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, অগমেন্টেড রিয়ালিটি সব জনগণের জীবনকে আরও সুন্দর ও মধুর করে তোলবার জন্য। কী রকম মধুর? ধরা যাক, আপনি চাইলেন, অফিসে বসেই বাড়ির এসি মেশিনটাকে অন করে রাখবেন, যাতে বাড়ি ফিরেই আপনি রেডিমেড ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকতে পারেন। বা ধরুন আপনি মদ খেয়ে গাড়ি ড্রাইভ করতে গেলেন, গাড়ি নিজে থেকেই চলল না। তখন আপনার গাড়ি রোবটের মতো কাজ করছে ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে। সে আপনার মুখ দিয়ে বেরোনো অ্যালকোহলের গন্ধ চিনে নিয়ে বা আপনি কথা বলে উঠতেই সেই কথার ধ্বনিচ্ছবি থেকে সে জানতে পেরে গেছে আপনি মদ্যপ। আর মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই আপনার গাড়ি আপনার বন্ধুর মতো নিঃশর্তে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকে অপরাধ করার হাত থেকে রক্ষা করল। আপনি খেয়াল করেন নি, আমি যে দুটো দৃষ্টান্ত দিয়েছি তা কেবল বাড়িতে এসিওয়ালা ব্যক্তির এবং গাড়ির মালিকের, শুধু গাড়ির মালিক নন, এমন গাড়ির মালিক যে গাড়িতে ওই ফিচার লাগানো আছে। এবার দেখুন, একদম টাটকা হিসেব অনুযায়ী দেশের ৫% লোকের বাড়িতে এসি আছে। আর ২০১১-র সেন্সাস অনুযায়ী ভারতে কেবল ৫% লোকের কাছেই গাড়ি আছে। যদিও ২০১৬-য় নাকি হিসেব করা হয়েছে সেই গাড়ির মালিকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১%-এ। আর ওই ধরনের গাড়ি, যে গাড়িতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ফিচার লাগানো আছে তার সংখ্যা নিশ্চয় গণনাতেই আসবে না।

আরও একটা টেকনিকাল দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ওসিআর অর্থাৎ অপটিকাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন— যার কাজ টাইপ করা লেখাকে চিনে তাকে টেক্সটে রূপান্তরিত করা। তাই কোনো লেখার ছবি আপনার কাছে থাকলে তা থেকে ওসিআর, ওই লেখার টেক্সট বানিয়ে আপনাকে দেবে। আচ্ছা এইবার ভাবুন তো— এই ওসিআর জিনিসটা নিয়ে আপনার কী হবে? আপনি এমনিতেই আপনার নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতার সৌজন্যে চোখে দেখে অজস্র রকম হরফে ছাপানো লেখা, অজস্র রকম হাতে লেখা বাংলা টেক্সট চিনতে পারেন, অর্থাৎ পড়তে পারেন উপরন্তু সেই টেক্সটের মানেও বুঝতে পারেন। এতকিছু ওসিআর এখনও পারে না। এবার একজন ওসিআর স্পেশালিস্ট বলবেন, আরে এই যে লাখ-লাখ পাতার ডকুমেন্ট অনলাইনে প্রকাশ করতে গেলে (তথ্যের অধিকার তো মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অধিকার) আগে অনেক মানুষকে দিয়ে তা টাইপ করিয়ে নিতে হত — ওসিআর এসে যাওয়ার ফলে সেই কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। সহজ কীভাবে হয়েছে? এক, সময় সাশ্রয় হয়েছে, দুই, অতগুলো লোককে পয়সা দিতে হচ্ছে না ফলে খরচের পরিমাণ কমানো গেছে। অতগুলো লোকের কাজ যে গেল—

এইরকম পুরোনপন্থী ক্লাসিক যন্ত্রবিরোধী কথা যদি না-ও ভাবি, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, প্রথমত সেই ডকুমেন্ট ছবি হিসেবে থাকলে জনতার 'তথ্যের অধিকার' কোথায় খর্ব হত? দ্বিতীয়ত, বই বা খাতা খুলে যে জিনিস পড়তে হত সে জিনিস এখন ল্যাপটপ বা ট্যাব বা মোবাইলে পড়তে হয়, একটা না একটা ডিভাইস তো লাগেই। ওদিকে ডকুমেন্টের সেই ছবি— ধরা যাক সে ছবি লক্ষ লক্ষ পুরোনো দলিল দস্তাবেজ, সেসব টেক্সট করেই বা কী লাভ? হ্যাঁ মানছি, ওই লেখার ছবি থেকে টেক্সটে রূপান্তর কতিপয় লোকের কাজে লাগবে। বিশেষত যাঁরা প্রকাশনার কাজের সঙ্গে যুক্ত বা সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে বলব আপনি কলেজস্ট্রিট পাড়ায় গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। সিংহভাগ প্রকাশক এখনও ইউনিকোড শব্দের মানেই বোঝেন না। আর সময়ের সাশ্রয় করার চেষ্টা তো অনেক দিন ধরেই চলছে, মানুষের সভ্যতায় সেই 'বাঁচানো সময়' কী কাজে লেগেছে— একটু ভেবে বলুন তো দেখি? ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জয় গোস্বামীর এখন সময় বেশি— সবকিছু এই ইন্টারনেট নির্ভর বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সৌজন্যে ঘটতে থাকার ফলে (ধরে নিচ্ছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক সাকসেসফুল প্রজেক্ট)— তাতে কি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে জয় গোস্বামীর প্রোডাক্টিভিটি বেড়েছে? এখন আপনি বলবেন সে তো ব্যক্তি-বিশেষের ব্যাপার। ঠিক আছে, আপনি সামগ্রিকভাবে একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার ভুল ভেঙে দিন না।

তবে কিনা পৃথিবীর বর্তমান অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ (শুধুমাত্র রেভিনিউ আয় করে নয়, সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবতি করেও) করেন যাঁরা তাঁদের হাতেও নিশ্চয়ই আরও জটিল কোনো যুক্তির অস্ত্র থাকবে যা দিয়ে তাঁরা আমার এই বালখিল্যসুলভ সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমার প্রত্যুত্তর দেওয়ারও অবস্থা থাকবে না কারণ ওই বিদ্যে আমার নেই। বরং আমি যে দিকে পাঠকের নজর টানব তা হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রতি বাহ্যিকভাবে (চমস্কি যাকে ইঞ্জিনিয়ারিং বলেছেন) আকৃষ্ট হওয়া এবং তার গুণগান গাওয়ার মধ্যে রাষ্ট্রের কী কী সুবিধে হতে পারে সেই দিকে। সেইসঙ্গে নজর টানব ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি মানুষের আগ্রহের দিকে, যার আড়ালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওত পেতে বসে থাকে আর ইমেল, নানারকম সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মারফৎ ব্যবহারকারী মোহগ্রস্ত মানুষের যাবতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, এমনকি সামাজিক পরিচয় জেনে নেয়। জেনে নিয়ে কী করে? এ প্রশ্নের একটা উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক, আপনি অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার মতো কাজ বা অন্যান্য জরুরি কাজ করছেন। একবারও ভেবে দেখেছেন কি যে সেই অনলাইনে কাজ করবার জন্য আপনি যে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন তা কোনো বহুজাতিক সংস্থার। এবং আপনার কথোপকথনের, কাজের সমস্ত তথ্য সেই কোম্পানি বিনা পরিশ্রমে হাতে পেয়ে যাচ্ছে।

আর একটা উত্তর আমার ঠিক জানা নেই, কিন্তু কলোনিয়ালিজমের একটা পুরোনো প্রবাদ মনে আছে— 'নো দেম অ্যান্ড রুল দেম'। কে জানে রাষ্ট্রেরও তার জনতা-জনার্দনের প্রতি সেই রকম কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা! কিংবা এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জোরেই গোটা পৃথিবীটা আসলে দখল করতে চায় ওই ব্যবসাদারেরাই। 'রুল'-এর রুল বদলে গেছে হয়ত আজ, তাই হয়ত পরাধীনতায় আজ আর গ্লানি জন্মায় না। মনে হয় ওইটেতেই চরম সুখ। আরও খেয়াল রাখতে বলব— কেমন নিজেদের অগোচরে গোটা পৃথিবীতে কেবল ক্রেতা আর বিক্রেতার মতো সম্পর্ককেই টিকিয়ে রেখেছি আমরা আর অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

আমি বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ নই ফলে আমার দেখার জায়গা আমার চারপাশ। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী কাজে লাগে, কীভাবে কাজে লাগে সেটা দেখতে গেলেই তো এই প্রশ্নগুলোই সকলের আগে এসে দাঁড়ায়। আমরা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খাই, আমাদের সঙ্গে সেই চা-বিক্রেতা কাকিমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। তাঁর স্বামী মারা গেছেন কিছুদিন হল। আমরা কাকা বেঁচে থাকতেই সেই দোকানে চা খেতাম। সেই সূত্রেই তিনি কাকিমা। তাঁর একটিমাত্র ছেলে মূক, কোনো কাজ- কাম করে না। দোকানে আমরা চা-বিস্কুট খেয়ে পয়সা দিলে কাকিমা তাঁর ছেলেকে হিসেব করতে শেখান। আমরাও যোগ দিই মাঝে মধ্যে ওই সহজ মূক ছেলেটার শেখবার প্রক্রিয়ায়। কাকিমা দোকান না বসালে আমরা তার পাশের দোকান থেকে চা খাই না, কাকিমা দুদিন দোকান না বসালে আমরা চিন্তা করি— কী হল বল তো? এই যে আমাদের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে গড়ে ওঠা সম্পর্কও আমাদের অর্থনীতির বাইরে নিয়ে যায়, ওইটা ছিল পুরোনো বাজার অর্থনীতির বড় কথা। আমি প্রায় বারো বছর ধরে কম্পিউটারের লোকজনের কাজে লাগে এমন ভাষাতত্ত্ব করছি বা আদৌ ভাষাতত্ত্বই করছি না, কারণ ভারতবর্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভাষার যে স্তরে কাজ করতে শিখছে, তা ক্লাস টেনের ব্যাকরণ দিয়েই সামলে দেওয়া যায়। যে কাজই করি না কেন, এইটুকু বুঝতে

বাকি নেই যে, রাষ্ট্র ওই বিশেষ ৫% থেকে ১০% লোকের কথা ভেবেই কাজ করে। কারণ ওই শতাংশের ভোটটা সম্ভবত খুব এসেন্সিয়াল। চায়ের দোকানের কাকিমা, দিনমজুর বা কৃষকদের হাওয়া নিজের রাজনীতির পালে লাগানোর জন্য অন্য বন্দোবস্ত তো রাষ্ট্রের হাতে রয়েইছে। যন্ত্র চিরকালই একটা বিশেষ শ্রেণির মানুষকে সুবিধে দেয়। গ্রামে গিয়ে কিছুদিন আগেও শুনে এলাম, এখন মেশিন দিয়ে ধান কাটার ফলে, খড়ের ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গরুর খাবার ছাড়া এখন শুকনো ধানগাছ বা খড় মানুষের আর কোনো কাজেই লাগে না। চাষের কাজে যন্ত্র-নির্ভরতা, সারের ব্যবহার, কীটনাশকের এবং হাইব্রিড বীজের ব্যবহার উৎপাদন বাড়িয়েছে যতটা, ততটা ক্ষতিও করেছে মানুষের। ক্ষতি করেছে অর্থনীতির, ক্ষতি করেছে স্বাস্থ্যের।

এটাও বুঝতে হবে, আপনি যদি এইরকম সব প্রশ্ন তুলতে চান তাহলে তার উত্তরের ব্যবস্থাও রাষ্ট্র তার নিজের সপক্ষে করে রেখেছে। তাঁরা বলবেন, কেন? টেলি যোগাযোগের ব্যবস্থায় তো অসংখ্য মানুষ উপকৃত হন। সেই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়েও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কাজে লাগে। এখন ঘরে ঘরে এসি বললেও মাত্র ৫% লোকের কথা বোঝায়। কিন্তু মোবাইল ব্যবহারকারী তো দেশের এক বিরাট জনসংখ্যা। কিন্তু প্রশ্ন উঠবেই, সে মোবাইল কতটা আধুনিক? সেই মোবাইল কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপলিকেশন বহন করতে পারে? না। ভারতে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন এমন লোকের সংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৩%-এর আশেপাশে। মোবাইল ফোনভিত্তিক পরিষেবা— যেমন টাকা ট্রান্সফার, অনলাইন কেনাকাটা ইত্যাদি; এছাড়া সরকারি উৎসবে, আনন্দে শুভেচ্ছাবার্তা, সতর্কতা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদির সুবিধা ওই ১৩% লোকও পান কিনা সন্দেহ। ১৩% যদি স্মার্টফোন ব্যবহারকারী হয় তাহলে পরিবারভিত্তিক হিসেব কষলে অঙ্কটা নিশ্চয়ই আরও নিচে নামবে। একটা পরিবারে যদি বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাদ দিয়ে সকলের হাতেও স্মার্ট ফোন থাকে, তাহলেও। তবু যে কথাটা মনে রাখা দরকার তা হল এই যে, এই লকডাউনে কত মানুষের কাজ নেই, কত ছোট ব্যবসার অবস্থা খারাপ কিন্তু ঐসব সেক্টরে তো ক্ষতি হল না। বরং বাড়িতে বসে মানুষ সবচেয়ে ব্যবহার করল সেই পণ্য যা তথ্য-প্রযুক্তির উৎপাদন। ঘরবন্দী মানুষের সহায় হল কেবল তার মোবাইল ফোন। কত ইন্টারনেট ডেটা এই ক'দিনে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারী মানুষ ব্যবহার করলেন সেই হিসেব পাওয়া গেলে চিত্রটা পরিষ্কার হত।

এসব কথা বলছি তার কারণ, একটা বিষাদ এই মুহূর্তে আমাদের সকলকে গ্রাস করেছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ এক মারণ রোগের শিকার। এইরকম এক বিরাট সমস্যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী কাজে লাগছে? অনেকে বলবেন, এই সময় যে গৃহবন্দী মানুষ ঘরে বসেই সব খবর পাচ্ছেন, ছেলেমেয়েরা অনলাইনে ক্লাস করতে পারছে, তার বেলা? যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অনলাইনে ক্লাস করতে পারছে, সেই বাড়ির লোক হওয়ার সুবাদে দেখতেই পাচ্ছি কীরকম ক্লাস হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়েরাও অনলাইনে ক্লাস করছে তো? যদি সকলেই করছে ধরে নিই, তাহলেও কিন্তু ৭%-এর মতো। তার ওপর অনলাইনে ক্লাস করার অন্য গ্যাঁড়াকলের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রবিশেষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাজনিত প্রযুক্তির প্রয়োগে আমারও কোনো আপত্তি নেই। কারুরই থাকার কথা নয়। আমি 'সমাজবাদ' নামক এক অলীক বিমূর্ত ধারণা সামনে রেখেও কথাটা বলছি না। কিন্তু মানব সভ্যতার বিকাশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা আছে, মানুষের সার্বিক বিকাশে তার অবদান অনস্বীকার্য— এই বিষয়ে আমি আপত্তি তুলছি। মোটামুটি যে কটা ঘটনা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা শিখেছি তাতে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের পাশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকারের কথাই রাষ্ট্রকে ভাবতে হবে, যদি সেই রাষ্ট্র সত্যিই জনদরদী হতে চায়। ভারতে স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে ধরা শেষ বাজেটে টাকার পরিমাণ মোট বাজেটের ২.৫%। হায় রে মানুষ!

'যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত।' 'সভ্যতার সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ হয়তো খানিকটা মিটতো আজকের ভারতবর্ষের ছবিটা দেখতে পেলে। কারণ যন্ত্রশক্তির সাহায্যে আমাদের এই দেশ আসলে নিজের লোকের ওপরেই কর্তৃত্ব করতে চাইছে আর দেশটাকে বিক্রি করে দিতে চাইছে বাণিজ্য সংস্থার হাতে।

উমা

আমিই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি

নরেন্দ্র দামোদর দাভোলকার

(যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারবিরোধী ব্যক্তিত্ব ডা: নরেন্দ্র অচ্যুত দামোদর দাভোলকার-এর মারাঠি বই 'তিমিরাতুনি তেজকাডে'-কে 'দ্য কেস ফর রিজন' নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন সুমন ওক। ঐ বই থেকে নীচের উদ্ধৃতাংশটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ভবানীপ্রসাদ সাহু।)

'আমার বিজ্ঞান : আমার আধ্যাত্মিকতা' এই বিষয় নিয়ে আমাকে একবার বলতে বলা হয়েছিল। বিষয়টির অভিনবত্বের কারণে 'অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতি'-র কর্মীবৃন্দ এবং অন্যান্য মানুষজন — উভয়ের কাছেই এটি সমানভাবে প্রশংসিত হয়। কিন্তু আসলে 'আমরাই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি এই শিরোনামে মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জায়গায় আমার দেওয়া বক্তৃতার পেছনে যে চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল এটি ছিল তারই ধারাবাহিকতা। বিষয়টি, বিশেষ করে তার শিরোনামটি, একটু পরস্পরবিরোধী। নিজের চিন্তাভাবনার বিরোধিতা না করে, একজন না-ধার্মিক ব্যক্তি কিভাবে নিজেকে প্রকৃত ধার্মিক হিসেবে ঘোষণা করতে পারে? আমি কিন্তু চালিয়ে গিয়েছিলাম।

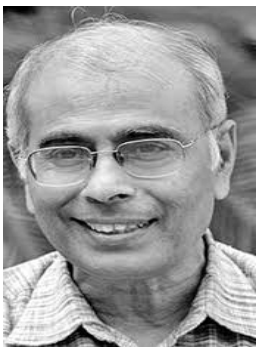

এখন ধর্মীয় আবেগকে নিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে, তাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে, তার বিকৃতি ঘটিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থেও তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই কারণেই আমি ঐভাবে শব্দচয়ন করেছিলাম। যারা এসব কাজ করছে তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা বা তার নৈতিক দিকটির কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের কাছে ধর্ম মানে হচ্ছে কিছু আচার অনুষ্ঠান, পুরোহিত স্থানীয় ধর্মীয় নেতার কর্তৃত্ব ও মানসিক দাসত্ব। আমার কাছে আমার যুক্তিবাদী নৈতিকতাই আমার ধর্ম, আমি এই ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেই বেঁচে আছি। শুধুমাত্র এই অর্থেই আমি ধার্মিক। আমি আমার বাবা-মায়ের ধর্ম পেয়েছি, তাকে আমি ত্যাগও করি নি, অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিতও হই নি। এইভাবে আমি জন্মগতভাবে হিন্দুই থেকে গেছি। স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ঐ জন্মগত ধর্ম থেকে তার মুনি ঋষি ও সমাজ সংস্কারকদের শিক্ষাও উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। এবং বিশাল মাপের এই সব ব্যক্তিরা ধার্মিকতার যে মহতী তাৎপর্য সংজ্ঞায়িত করেছেন তা আমি স্বীকার করি।

আমার আদর্শগত প্রতিপক্ষরা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবে (অধার্মিক বা ধর্মবিরোধির চেয়ে) না-ধার্মিক হিসেবেই চিহ্নিত করে। ধর্ম বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা করার একমাত্র অধিকার তারাই করায়ত্ত করতে চায় এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তও তারাই নিতে চায়। ধর্মের মত একটি শক্তিশালী হাতিয়ারকে শুধু তাদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে, তাদের ধর্মীয় চিন্তাভাবনার রাজত্বে ঢোকার জন্য একটি কৌশল আমি অবলম্বন করেছি এবং সোচ্চারে এটি ঘোষণা করছি, ''আমিই প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি, আর তোমরা সবাই মেকি ধার্মিক।'' 'বাবু', 'দাদা', 'পরমপূজ্য' এই ধরনের নানা অভিধা নিয়ে এখনকার তথাকথিত আধ্যাত্মিক নেতারা বিশাল ব্যবসা করছে। তাদের ভক্তের সংখ্যাও লক্ষ লক্ষ। এ ব্যাপারটির একটি সাধারণ ব্যাখ্যা আছে। —ধর্মীয় জাগরণ ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার নিপীড়িত মানুষের মধ্যে একটি অবলম্বনের মতো কাজ করে এবং দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করে। অবশ্যই এর মধ্যে কিছু সত্যতাও আছে।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার পছন্দ নাস্তিকতা হলেও, আমি বিশ্বাস করি যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ধর্মের সমালোচনা করার পূর্বশর্ত হচ্ছে তার সামাজিক দিকটি অনুধাবন করা। সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম— উভয়েরই আরো পরিণত, বিজ্ঞ ও সহনশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল এবং তার মধ্যে কোনও দু'ধরনের মত নেই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বলতে এটিই বোঝায় যে, ধাপে ধাপে 'পর্যবেক্ষণ থেকে পরীক্ষা'-র পদ্ধতির মাধ্যমে সত্য-কে আবিষ্কার করা। এই পদ্ধতি সর্বদাই নম্র। এটি কখনোই দাবি করে না যে, সে চরম সত্য জেনে ফেলেছে, কিন্তু সত্যকে তুলে ধরাটা সে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এই সত্য সর্বজনীন ও বস্তুগত।

এটি পরিণতি ও উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়, যা আমাদের সমাজের সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গবেষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বরং তার প্রয়োগ ঘটানো দরকার জীবনের সর্বক্ষেত্রেই।

চেতনার বিজ্ঞান যে অধ্যাত্ম তার অর্থ হচ্ছে আত্মার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। যাঁরা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁরা অধ্যাত্মকে একটি ফাঁপা অর্থহীন আলোচনা বলে মনে করেন। যখন অধ্যাত্মবাদীরা বলে 'যেখানে বিজ্ঞানের শেষ হয় সেখান থেকে শুরু হয় অধ্যাত্মবাদ', তখন বিরোধীরা বলেন, 'প্রাচীনকাল তার সৃষ্টির সময় থেকে আজ অব্দি অধ্যাত্মবাদ কখনোই মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র ও বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলির কোনও সমাধান করতে পারে নি। বিজ্ঞানের অবস্থান এর বিপরীতে। সমস্যা থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে বিজ্ঞান যখন এগিয়ে এসেছে, অধ্যাত্মবাদ তখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেই প্রামণিত হয়েছে।' এই বিতর্ককে আমরা এখন একটু দূরে সরিয়ে রাখছি।

আধ্যাত্মিক নীতির চরিত্র নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মীয় গোষ্ঠী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে। তবে এইসব দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে দু'টি ক্ষেত্রে মোটাদাগের মিল রয়েছে — প্রথমত, অধ্যাত্মবাদ হচ্ছে একটি আধিবিদ্যক বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং এর কাজ কারবার এই পার্থিব জগতের বাইরের বিষয়কে কেন্দ্র করে। এই আলোচনায় পার্থিব জীবন কম গুরুত্বপূর্ণ, বরং বিপরীতে, তার অনুসন্ধান অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য। আত্মার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য কি? একজনের জীবদ্দশার আগে ও পরে এটি কোথায় থাকে? এটি কি বিভিন্ন যোনি (একটি কল্পিত প্রাণবান অস্তিত্ব, যার সংখ্যা ৮৪ লক্ষ) দিয়ে বিবর্তিত হয়ে আসে? আত্মা কি অমর? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা কে? তার উদ্দেশ্যই বা কি? কে এর পরিচালনা করে? আত্মার সঙ্গে ঐ সৃষ্টিকর্তা সত্ত্বার সম্পর্ক কি? আত্মসমীক্ষার বা আত্মকথনের অর্থ কি? দেখার জন্য চোখ দুটোকে কে উপযুক্ত করে তোলে?

বিভিন্ন কারণে এটি (আত্মা) অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে, কলঙ্কিত ও শৃঙ্খলিত (আত্মীয়-সম্পর্ক ও আবেগের শৃঙ্খলে) এবং দুঃখপ্রবণ। যখন এই জীবনী সত্তাটি জানতে পারে যে কে ও কি, তখন সে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে এবং চিরন্তন আনন্দ খুঁজে পায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিসত্ত্বা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা ও 'ঈশ্বর' বা পরমেশ্বর (বা পরমাত্মা, সর্বোচ্চ আত্মা)। ব্যক্তি বিশেষের মূলভাবটি হল আধ্যাত্মিক এবং তাকে বলা হয় আত্মা বা 'আত্মন'। যখন আত্মন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন যে চিরন্তন সুখ বা সচ্চিদানন্দের অবস্থায় পৌঁছয়। যে জৈব সত্ত্বাটি সাধারণত দুঃখে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, সে তখন আত্ম উপলব্ধির জ্ঞানে আলোকিত হয়ে ওঠে— বুঝতে পারে সে কি— এবং সমস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী আনন্দের অবস্থায় পৌঁছয়। ধর্ম মানুষকে দেখায় কিভাবে এই মিলন অর্জন করা যায়। নিজের মুক্তির জন্য এই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সে পবিত্রগ্রন্থ ও ঐশ্বরিক বাণীর কথা বলে। যুক্তি দিয়ে দেখলে, ঐ আধ্যাত্মিক সত্ত্বা বা আত্মা জীবন্ত ও সংবেদনশীল হওয়ার কারণে সে আনন্দ বা দুঃখ অনুভব করতে সক্ষম। এটি জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সংবেদনশীল হওয়ার কারণে সে আনন্দ বা দুঃখ অনুভব করতে সক্ষম। কেবলমাত্র জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্ত্বারই করুণা, প্রেম, দয়া ও নৈতিকতার মতো আবেগ থাকতে পারে। অধ্যাত্মবাদের ধারণায় প্রত্যেকেরই আত্মা আছে। ঈশ্বর শুধু আরেকটি আত্মা নয়, সে পরম আত্মাও, সে পবিত্রতম। যখন ব্যক্তিগত আত্মা পরম আত্মার দেখা পায়, তখন সে-ও পবিত্র হয়ে ওঠে। ব্যক্তির সব অসম্পূর্ণতা দূর হয়, সব দিক থেকে সে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর এ কারণে জীবনে সবাইকে এই পথটিই অনুসরণ করতে বলা হয়।

এই সব ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। বিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা জানি, বর্তমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি বিমূর্ত শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বর্তমান বিশ্বের সবকিছুর পূর্বসূরী ঐ শক্তি। তবে এই শক্তি প্রাণহীন। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় অজৈব পদার্থ, প্রাণ ও জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। আদিম ঐ শক্তিকে প্রাণবান বলা যায় না, কারণ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে জীবনের অর্থ জীবিত মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি অন্য কোনভাবে থাকতে পারে না। তাই এ ধরনের বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নেই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিম সত্ত্বাটি সর্বদর্শী, সংবেদনশীল, নৈতিক, ত্রুটিহীন ও আনন্দময়। একই সঙ্গে মানুষ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষভাবে উন্নত জীবন অর্জন করেছে। 'ঈশ্বর তার নিজের মতো করে মানুষকে সৃষ্টি করেছে' এটি সত্য নয়। বরং এটিই বলা উচিত যে, মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে বিবর্তনের একটি অসাধারণ স্তরে উপনীত হয়েছে।

ঐ ধরনের কথাবার্তার অন্য বিপদও আছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সরাসরি তার মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে, অধ্যাত্মবাদের ঐ সব কথাবার্তা মানুষকে উপদেশ দেয় তা থেকে পালিয়ে যেতে এবং চিরন্তন আনন্দের অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য নিজের আত্মন-কে অস্তিত্বহীন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করতে।

অধ্যাত্মচর্চার অন্যদিক হচ্ছে মনকে নির্মল করা। এর জন্য কুণ্ডলিনী, যোগ, সুদর্শন ক্রিয়া, নামজপ (দেবতার নাম আবৃত্তি করা) ইত্যাদির মতো যে সব প্রক্রিয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই। আধ্যাত্মিকতা চায় মন থেকে কামনা-বাসনা দূর করার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করা এবং নৈতিক গুণাবলীর চর্চা করা। এটি বিশ্বাস করে যে জীবনে জৈবিক আরাম ও শারীরিক সুখের চেয়েও বেশি মূল্যবান কিছু অর্জন করার আছে।

অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে, একটি উত্তম ও মূল্যবান জীবনের জন্য সম্পদ, আরাম, আনন্দ, সম্মান ও মর্যাদা অত্যাবশ্যক। কিন্তু একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানুষ এইসব জাগতিক বিচ্যুতিকে ছাড়িয়ে যান। অন্যের কাছে কিছু না চেয়ে বা না গ্রহণ করে, তাঁরা বিনয়, নৈতিক ও সরল জীবনের শপথ নেন। তাঁদের কাজকর্ম মমতাময় এবং অন্য মানুষের জন্য। এই ধরনের আচরণ নিজেই আধ্যাত্মিকতা; বাকিগুলি ফাঁকা বুলি মাত্র। নিজেকে যা নৈতিক দিক থেকে সচেতন রাখে তা হল 'নমাকরণ' (ঈশ্বরকে মনে রাখা এবং তাঁর নামগান করা); যদি সেটি তা না করে তবে তা মিছে কোলাহল ছাড়া কিছুই নয়। যদি কোনও তথাকথিত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি কোটি কোটি টাকার বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন, উৎকট ভুরিভোজ খেতে থাকেন, পরেন দামি সিল্কের পোষাক আর সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করতে থাকেন, তাহলে তার জীবনের বৈপরীত্য সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। তার কারণ অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিকতা সংযত আচরণ, ভালোমন্দের জ্ঞান এবং পরদ্রব্য গ্রহণ না করার সঙ্গে সম্পর্কিত।

আধ্যাত্মিকতার আরেকটি দিক আছে। মানুষের আবেগ সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের বিজয় দেখতে চায়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আধ্যাত্মিকতা একটি পন্থা হিসেবে দেখা হয়। প্রত্যেক ধর্মই শেষ অব্দি মানবিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এই প্রত্যয়ই ধর্ম বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই অর্থে সব ধর্মের অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিকতা একই। বিনোবা ভাবে আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, ''রাজনীতি ও ধর্ম মিলিয়ে যাবে; বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা বিজয়ী হবে।'' এই মন্তব্যটি ভাল করে বোঝা দরকার। রাজনীতি এমন একটা ক্ষেত্র যেখানে কায়েমি স্বার্থরা — স্থানীয়-জাতীয়-আন্তর্জাতিক — নানা স্তরে প্রাপ্ত সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে। মানুষকে যথেষ্ট সুখে রাখার জন্য নানা উপকরণের জোগান বিজ্ঞান দিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলির লড়াইয়ের কারণে জনগণ এ থেকে বঞ্চিত হয়। পরিসংখ্যানও এটিই প্রমাণ করে। ভারতসহ সারা বিশ্বের দেশগুলিই তাদের বাজেটের বড় অংশ সামরিক খাতের জন্য আলাদা করে রাখে। যুদ্ধের রাজনীতি প্রাপ্ত সব অর্থ ব্যয় করে দেয়। উন্নয়নের জন্য কিছুই পড়ে থাকে না। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ব্যয় অপরিহার্য, একইভাবে অপরিহার্য যুদ্ধের রাজনীতিও। কিন্তু মানুষ ক্রমশ সচেতন হচ্ছে, তাই এমন একটা সময়ের কল্পনা করা যায় যখন মানুষ এই ধরনের রাজনীতির ব্যর্থতা অনুভব করতে পারবে। যখন এটি ঘটবে, তখন মানুষের মঙ্গলের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাটি দূর হবে। যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা অর্থ তখন মানুষের উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবহৃত হবে।

এই একই ছবি ধর্মের প্রসঙ্গেও প্রসারিত করা যায়। ডা: রামমনোহর লোহিয়া সংক্ষেপে বলেছিলেন, ''রাজনীতি হচ্ছে স্বল্পমেয়াদি ধর্ম এবং ধর্ম হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী রাজনীতি।'' রাজনীতির মতো প্রত্যেকটি ধর্মেরই তার নিজস্ব নীতিকথা, দর্শন, আচার অনুষ্ঠান, পুরোহিত-যাজক সম্প্রদায় আছে এবং আছে শোষণও। দর্শন, আচার অনুষ্ঠান, পুরোহতি-যাজককুল— ধর্মের এইসব গৌণ দিকগুলি একসময় দূর করতে হবে এবং বিনোবাজি যেমন প্রস্তাব করেছিলেন, ঐভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গী হিসেবে আধ্যাত্মিকতা থাকবে।

সমস্ত ধর্মের মূল কথা হচ্ছে নৈতিকতার জয় এবং মানুষের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব সম্পর্কিত বিশ্বাস। হেতুবাদী তত্ত্বের মধ্যেও কি তার শিকড় নেই? কিন্তু তার বিরুদ্ধাচরণও নেই। কখনো কখনো সত্য জয় লাভ করলেও, অনেক ক্ষেত্রেই সেটি পরাজিতও হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ বলে, ''সত্য শেষ অব্দি ঈশ্বরের কৃপায় বিজয়ী হবে।'' এই কথাগুলি ব্যক্তিবিশেষের ঈশ্বর বিশ্বাসের যেমন পরিচায়ক, তা একই সঙ্গে সত্যের জয় দেখার জন্য তার সহজাত আকাঙ্ক্ষারও প্রকাশ ঘটায়। অন্যদিকে অবিশ্বাসীরা যেসব মূল্যবোধ পোষণ করে তা সফল করার জন্য সংগ্রাম করে চলে, এমনকি ঐ লক্ষ্য তার ক্ষমতার বাইরে হলেও। স্পষ্টতই তারা ঈশ্বরের সাহায্য বা ধর্মকে করে না। কিন্তু তাদের মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, অন্য মানুষ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীও ভাবনাচিন্তা না করেই যে নিছক নেওয়া হয়েছে তা নয়। এটি জানা আছে যে মানুষ অন্য মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়, আবার অন্য মানুষও আছে যারা অন্যের পথে বাধা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বেশ পারদর্শী। সংক্ষেপে বললে, একজন ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির মতো, একজন নাস্তিকেরও আশাবাদের প্রকাশ তার নিজস্ব মূল্যবোধগুলি অর্জন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটে।

উমা

কোভিড, স্টিগমা ও সমাজ

অরুণালোক ভট্টাচার্য

মানব সভ্যতার ইতিহাসে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সংকট উদ্ভূত হয়েছে। তার মধ্যে মানুষ সবচাইতে অসহায় বোধ করেছে দুটি বিপর্যয়কালে। একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অপরটি জীবাণুঘটিত।

আমাদের জীবদ্দশায় এই প্রথম কোভিড ১৯ নামক এক অতিমারির মুখোমুখি। আমাদের সমাজের বিভিন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়াগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক — ১) শহর কলকাতার ডাক্তারবাবু, যিনি কলকাতারই এক হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। সেই হাসপাতালের ১৭ জন নার্স কোভিড টেস্টে পজিটিভ হলেন। ডাক্তারবাবুর হাউসিং কমপ্লেক্স থেকে সেই হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে মৌখিক ফতোয়া জারি করা হল। শহরের আর এক ডাক্তারবাবু, যিনি চাকরি করেন শান্তিপুর হাসপাতালে। তিনি নিজের বাড়িতেও প্র্যাক্টিস করেন। একদিন সকালে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বাড়ির সামনে বাঁশের ব্যারিকেড। মহল্লার মানুষ তাঁর প্র্যাক্টিসে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছে। ২) যে হাসপাতালে কোভিড রুগীর চিকিৎসা হয়েছে বা যে হাসপাতালের ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীদের কোভিড টেস্ট পজিটিভ হয়েছে, সেই হাসপাতালের নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। মফঃস্বল বা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের পঞ্চায়েত অফিস থেকে তাঁদের একঘরে করে দেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে তাঁদের সঙ্গ পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। হাসপাতালগুলোতে কিন্তু উপসর্গহীন মানুষদের পরীক্ষার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। ৩) শহর কলকাতাতেই ঐ হাসপাতলের সাফাই কর্মচারীদের বলা হল যে, হাসপাতালের জঞ্জাল ঘেঁটে বাড়ি ঢোকা যাবে না। পুলিশের সাহায্য নিলে, বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হবে। ৪) উত্তর পূর্বাঞ্চলের ১৮৫ জন নার্স নিজেদের রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। মূলত তাঁদের শারীরিক গঠন মঙ্গোলিয় হওয়ার জন্য, তাঁরা ঘরে-বাইরে এবং কর্মস্থলে যে ভয়ানক মানসিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন তা ছিল অসহনীয়। ৫) কলকাতার প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, অনেকে হয়তো তার নাম বলতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর বয়স বা বাসস্থান বা বাপ-মায়ের পরিচয় অনেকেই বলে দেবেন। অনুরূপে, কোন পাড়ায় কে আক্রান্ত হলেন এবং তাঁর বাড়ি কিভাবে ব্যারিকেড করে দেওয়া হল এবং ঐ পরিবারের কতজনকে কোয়ারান্টাইনে পাঠানো হল সেইসব তথ্য কিন্তু পাড়ার মানুষদের নখদর্পণে। যাকে বলে রীতিমতো কলতলার চর্চা। এবং ভবিষ্যতের রেফারেন্স হিসাবে সেই বাড়ির বা বাড়ির মানুষজনকেও ব্যবহার করা হবে। যেমন রিকশাওয়ালাকে বলবেন — কোভিড বাড়ির পাঁচটা বাড়ি আগে। বা ধরুন, পরিচয় দেওয়ার সময় বলবেন, কোভিড হয়েছে যে বৃদ্ধের, তাঁর নাতির সহপাঠী হল আমার ছেলে। ৬) ওড়িশা হাইকোর্ট এক অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশিকা জারি করে বলেছিলেন যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কোভিড নেগেটিভ হলে, তবেই সেই রাজ্যে ঢুকতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্ট পরে এই আদেশ খারিজ করে দেন। ৭) সুদূর আমেরিকায় এশিয়া বংশোদ্ভূতদের ব্যবসা শতকরা ৪০ ভাগ কমে গিয়েছিল। তা ছাড়া দেশ পরিত্যাগের মৌখিক হুমকি তো ছিলই।

গ্রাম-শহরের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নেতা এবং মহামান্য আদালতের এই যে প্রতিক্রিয়া বা মনোভাব, তা কি খুব অস্বাভাবিক? ইতিহাস কি বলছে?

স্টিগমা শব্দটি আদতে গ্রীক, যার অর্থ ছিল শরীরে মনুষ্যকৃত কোনও স্থায়ী দাগ। পরে সেটিকে ব্যবহার করা হত দুষ্কৃতী বা বিশ্বাসঘাতক বা ক্রীতদাসকে বোঝাতে। আরো পরে এই স্টিগমা কথাটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হত যাঁরা শারীরিকভাবে

বিকলাঙ্গ বা মানসিক ভারসাম্যহীন বা সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে এই চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া বা স্টিগমাটাইজেশন প্রত্যেক মহামারি বা অতিমারির ক্ষেত্রেই ছিল অবশ্যম্ভাবী। আর এর ফলস্বরূপ, সমাজের গায়ে বিভাজনের চিড় ধরে। প্রথমত আমরা যাঁরা স্বঘোষিতভাবে সুস্থ। কারণ তাঁরা সামাজিক সুস্থতার যে মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ। দ্বিতীয় রয়েছেন— ওঁরা যাঁরা বিচ্যুত ওই সামাজিক বিধির বিধান থেকে। বলাই বাহুল্য যে, কোভিড রোগাক্রান্ত বা তাঁদের সংস্পর্শে আসা মানুষজন দ্বিতীয় দলভুক্ত। সাধারণ মানুষের কাছে এই বিভাজনটি একটি আপাতগ্রাহ্য, স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে দিকে, ব্রিটিশ সরকার যক্ষ্মা, কুষ্ঠ এবং মানসিক ব্যারামের জন্য স্যানিটোরিয়াম তৈরি করেছিলেন। রামানুজম-এর মতো ধুরন্ধর আংকিক পণ্ডিতকেও টিবি সন্দেহে ইংল্যান্ডের এক স্যানিটোরিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে, তৎকালীন ভারতবর্ষে এপিডেমিক অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে রুগীদের এই পৃথকীকরণকে আইনি মান্যতা দেওয়া হয়। স্বাধীন ভারতেও বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে কুষ্ঠ মান্যতা পেয়ে যায়। এমনকি আইন এও বলে কুষ্ঠ রুগী ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবে না বা ভোটে দাঁড়াতে পারবে না। সামাজিক ভাবে পরিত্যক্ত এই রুগীদের বেশিরভাগেরই স্থান হত পথের ধারে বা অস্বাস্থ্যকর কুষ্ঠ গারদে। সুতরাং রোগ ও বিভাজনের এই যে মানসিকতা, এটি মজ্জাগত।

স্টিগমা শব্দটি আদতে গ্রীক, যার অর্থ ছিল শরীরে মনুষ্যকৃত কোনও স্থায়ী দাগ। পরে সেটিকে ব্যবহার করা হত, দুষ্কৃতী বা বিশ্বাসঘাতক বা ক্রীতদাসকে বোঝাতে। আরো পরে এই স্টিগমা কথাটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হত যাঁরা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিক ভারসাম্যহীন বা সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ।

বিদেশেও এই বিভাজনের রং ছিল অত্যন্ত প্রকট। এই প্রসঙ্গে মার্কিন বায়োলজিস্ট ডব্লিউ শের্মান লিখিত বই 'Twelve Diseases that Changed Our World' উল্লেখ্য। তিনি বলছেন ১৮৯২ সালের কলেরা মহামারীতে ইউরোপে বহু মানুষ মারা যান। আতঙ্কিত তৎকালীন মার্কিন সরকার ইউরোপ থেকে আগত সকলকেই কোয়ারান্টাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরেই ৩৯০০০ মানুষকে কোয়ারান্টাইন করা হয়। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বেঞ্জামিন হ্যারিসন, এই ইউরোপ-প্রত্যাগত মানুষদের জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে সরাসরি দায়ী করেন। বহুদিন পর্যন্ত, আমেরিকায় আসতে থাকা ইউরোপীয়ান ইহুদিদের মনে সেই কলেরা বহনের কাল্পনিক কলঙ্ক এবং কোয়ারান্টাইনের আতঙ্ক বহুদিন পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৮৫৪ সালে কলেরার জীবাণু— ভিব্রিও কলেরি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, এর প্রায় ১০০ বছর পরে, ১৯৯৪ সালের ঘটনা। গুজরাটের সুরাট — পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম থেকে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল সুরাট শহরে। শহরের নিম্নবিত্ত অঞ্চলে ১৯৭ জনের প্লেগ ধরা পড়ল এবং তার মধ্যে ৫৪ জনের মৃত্যু ঘটলো। এক সপ্তাহের মধ্যেই যে ৫ লক্ষ মানুষ সুরাট শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, তার মধ্যে ছিলেন শহরের ৮০% স্বাস্থ্যকর্মী। দূরপাল্লার ট্রেন তখন সুরাট শহরে থামত না। অনেক মালবাহী জাহাজের বিশেষ করে যারা মধ্য প্রাচ্যে পাড়ি দিত, তাদের যাতায়াত বন্ধ। বহু অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা বন্ধ হয়েছিল। ভারত থেকে বিদেশ যাওয়া মানুষদের বিভিন্ন রকম বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে তবে সে দেশে প্রবেশের অনুমতি মিলত। শুধুমাত্র রপ্তানি বন্ধ হওয়ার জন্য আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৪২০০ লক্ষ মার্কিন ডলার-এর সমতুল্য। আজকের কোভিড-১৯ আক্রান্ত মানুষদের সঙ্গে খুব বেশি তফাত খুঁজে পাচ্ছেন কি? কিন্তু এরপরেই সুরাট শহর কিছু সামাজিক সংস্কারে ব্রতী হয়, যার ফলে ২০০৬-এর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর সঙ্গে যুঝতে সুরাটবাসীর খুব একটা অসুবিধে হয় নি, আতঙ্কও গ্রাস করে নি সুরাটবাসীকে।

১৯১৮-র স্প্যানিশ ফ্লু অতিমারি। শতাব্দীর ভয়ঙ্করতম অতিমারি। প্রায় তিন বছর ধরে চলা, এই অতিমারির নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক স্টিগমা। তৎকালীন স্পেনীয় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ছিল আমেরিকার চাইতে ভাল। তার ফলে তাঁরা এই ফ্লু সংক্রমণের সংবাদ প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, যা আমেরিকা পারেনি। যেহেতু স্পেন এই রোগের সংবাদ প্রথম প্রকাশ করেছি, তার ফলে সংক্রমণের নাম হয়ে গেল স্প্যানিশ ফ্লু। যদিও প্রাথমিকভাবে এই ফ্লুয়ের হটস্পট কিন্তু ছিল আমেরিকা। আফ্রিকান আমেরিকানরা এই ফ্লুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কম এবং তাঁদের মধ্যে মৃত্যুহারও ছিল অনেক কম। অথচ অদ্ভুতভাবে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা আফ্রিকানদের ঘাড়ে এই রোগ ছড়ানোর দায় চাপিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে তখন বর্ণবিদ্বেষ তুঙ্গে। শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশ এবং

ওলন্দাজরা ছলে এবং কৌশলে কালো আফ্রিকানদের জমি-জমা সব হাত করে মৌরসি পাট্টা জমিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই সারা পৃথিবী জুড়ে দেখা দিল ফ্লুর অতিমারি। যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিকদের হাত ধরে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। কালো আফ্রিকানদের বলির পাঁঠা বানিয়ে তাদের জমিজমা কেড়ে নেওয়ার পদ্ধতি আরো ত্বরান্বিত হল, এর সুদূরপ্রসারী ফল হয়েছিল ভয়াবহ। আফ্রিকানদের জমি কেড়ে নেওয়ার ফলে তাদের পরিবারে ভাঙন শুরু হয়। কাজের খোঁজে অল্পবয়সীরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায় দূরদূরান্তে। ফলে শিকড়হীন এই পরিযায়ীদের এক অন্যতর সমাজ গড়ে ওঠে। সেখানে তাই আজ খুন-জখম-ধর্ষণ-এর আধিক্য খুব বেশি। আজও ধর্ষণজনিত অপরাধের তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকা অন্যতম প্রধান। পরবর্তীতে আরেক সংক্রমণ — এইডসও সাউথ আফ্রিকানদের মধ্যে ভয়ঙ্করভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, এইডস সম্বন্ধীয় স্টিগমা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ২০০৯ সালেও পাঁচজন আমেরিকানদের মধ্যে একজন বিশ্বাস করতেন যে HIV ছড়ায় সংক্রমিত মানুষের সঙ্গে একই পানপাত্র ব্যবহার করলে বা একই সুইমিং পুলে সাঁতার কাটলে বা একই টয়লেট ব্যবহার করলে! চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রেও HIV সংক্রমিত মানুষদের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বজায় ছিল। বিখ্যাত সিনেমা ফিলাডেলফিয়াতে এই বৈষম্যের সুন্দর চিত্রায়ণ ঘটেছে।

১৯৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি থাবো মেবেকি এক দুর্বোধ্য কারণে বিশ্বাস করতেন যে এইডস রোগের কারণ HIV ভাইরাস নয়, সেটি অন্য কোনও এক পাপের ফসল। কলঙ্কের দাগের রঙের কত বৈচিত্র্য দেওয়া। কলঙ্কিত হওয়ার ভয়ে বেশিরভাগ এইডস রুগী পরীক্ষাই করাতেন না। আর বাকি এইডস রুগীদের এই অজুহাতে চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ প্রায় ৫ লক্ষ সাউথ আফ্রিকান মানুষ প্রায় বিনা চিকিৎসায় এইডস জনিত কারণে মারা যান। এই স্টিগমার জন্য এইডস অতিমারী দীর্ঘায়িত হয়েছে বহুদিন। ২০১৮ সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে এইডস রুগীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৮ কোটির মতো, আর মারা গিয়েছিল প্রায় ৮ লক্ষ মানুষ।

এই স্টিগমাটাইজড বা কলঙ্কিত মানুষদের তিনরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রথমত কেউ কেউ নিজেকে ভীষণভাবে গুটিয়ে নেন। তাঁদের মনে হয় এত মানুষ থাকতে তাঁরাই শুধু মানসিক লাঞ্ছনার শিকার কেন? ফলত সামাজিক ক্রিয়াকলাপ থেকে তাঁরা অনেক দূরে সরে যান। এইডস বা কুষ্ঠ বা যা রুগীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা আমরা অনেক দেখেছি। করোনা অতিমারি বেশিদিন চললে এরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। দ্বিতীয়ত যাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা সংক্রমিত, তখন তাঁরা নিজেদের উপসর্গ লুকোতে শুরু করেন কলঙ্কের ভয়ে। তাঁরা না কোনো পরীক্ষা করান, না কোনো চিকিৎসা করতে চান। এই গোত্রের মানুষরাই রোগের নতুন উৎস হিসাবে সমাজে ঘুরে বেড়ান। এই অজানা বাহকেরাই বোধহয় সমাজের সবচাইতে বিপজ্জনক মানুষ হয়ে ওঠেন। তৃতীয়ত, যাঁরা এই রোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্নরকম সুযোগ সুবিধা বা অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হন। বিদেশে যেমন এইডস রুগীদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা আছে, যেখানে বিনে পয়সায় খাদ্য বস্তু তো মেলেই আর মেলে আর্থিক অনুদান। কুষ্ঠ রুগীদের ভিক্ষা বৃত্তিতে কাজে লাগানোর কথা এই দেশে অশ্রুত নয়। ডাক্তারবাবুদের গায়ে করোনা রুগীদের থুতু ছেটানোও এরকমই এক অসামাজিক ঘটনা।

এই সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির পথ বাতলাবেন সমাজতত্ত্ববিদ এবং নৃতত্ত্ববিদরা। খুব সাধারণভাবে বললে বলা যায়, এই সামাজিক পৃথকীকরণ থেকে বাঁচতে গেলে যেটা সবচাইতে জরুরি সেটি হল মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা। এর প্রথম ধাপ হল সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জনস্বাস্থ্যের ন্যূনতম সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। বিশেষ করে সেইসব মানুষদের কাছে, যাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। পরিষেবার এই বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত হবে স্বাস্থ্য চেতনা বা স্বাস্থ্য জ্ঞান। দূর হবে ভ্রান্ত ধারণা আতঙ্ক। যে মানুষটার দু'বেলা খাবার জলই জোটে না, তাকে কোভিড নিবারণে সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়ার কথা বললে সেটি হবে তার কাছে অবোধ্য। এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে কোনও সংক্রমণের যুদ্ধে গোষ্ঠীগতভাবে লড়াই করার জন্য পারস্পরিক সমঝোতা, পরিসংখ্যানের স্বচ্ছতা এই অস্ত্রগুলিকে শান দিতে হয়। জিনিসগুলো লিখতে যত সহজ, বাস্তবায়িত করা কিন্তু খুব কঠিন। স্প্যানিশ ফ্লু থেকে শুরু করে কোভিড পর্যন্ত গত ১০০ বছরে যত মহামারী বা অতিমারি বিশ্ব দেখেছে তার থেকে পরিবর্তনযোগ্য শিক্ষা কতটা পেয়েছে বলা মুশকিল। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকা তার জি ডি পির ১৬.৯% স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে মোটামুটি ১০ থেকে ১২% আর ভারতবর্ষে ৩.৬%। আরও রাজনৈতিক সচেতনতার এবং সদিচ্ছার প্রয়োজন। নাহলে নভোচারী মানুষটির সঙ্গে একঘরে করে দেওয়ার ফতোয়া জারি করা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বাস্থ্য চেতনার মেলবন্ধন ঘটবে কী করে?

উমা

হুগলি নদীর মোহনার হাল-হকিকত

তপোব্রত সান্যাল

গত বছর জুলাইয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় তরুণকুমার চৌধুরি-র 'উৎস ও সমস্যা' চিঠির প্রেক্ষিতে এই নিবন্ধ। চিঠির সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রতিপাদ্য বিষয়টি পরিস্ফুট হয় নি। পত্রলেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন হুগলি নদীর মোহনায় বালারি 'নদীখাত' পলিমুক্ত না করলে অদূর ভবিষ্যতে জোয়ারের জল ডায়মন্ডহারবারের উজানে সংবাহিত হবে না। হলদিয়া মোহনার পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনা তাই জরুরি।

হুগলি নদীর মোহনার বিদ্যমান পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক তাতে কোনো দ্বিমত নেই। তবু মোহনা-অঞ্চল কেন, তার ওপরের অংশটির অবস্থাও একেবারেই আশাপ্রদ নয়। হুগলি ও ভাগীরথী অভিন্ন নদী। ভাগীরথীর জোয়ার-প্রভাবিত অংশটি হল হুগলি। হুগলি সমুদ্র-মুখ থেকে ভাগীরথী-জলঙ্গির সঙ্গমস্থল পর্যন্ত প্রসারিত। মূলত ভাসমান পলিভারের বিপুলতা ও পরিবর্তনশীলতা, উদান থেকে ভাগীরথীর মাধ্যমে আসা জলের পরিমাণ এবং জোয়ারের সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট লবণাক্ত জলের পরিমানের নিত্য অসাম্য হুগলি নদীর পলি সংবহন ও প্রবাহ বিন্যাসকে জটিল করে তুলেছে। হুগলি নদীর মোহনায় পলিভারের সঞ্চরণ ও সঞ্চয় পোত-চলাচলের পথকে মাঝে মাঝেই দুরতিক্রম্য করে তুলছে। পলি-খনন করে পরিস্থিতি অস্থায়ীভাবে সামাল দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, তবে এখন বোঝার সময় এসেছে এ-সমস্যার কোনো চটজলদি সমাধান নেই। সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে হবে।

একথা সুজ্ঞাত যে ফরাক্কায় সরন্ধ্র বাঁধ (ব্যারাজ) নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল ঐ বাঁধে গঙ্গার জল অবরুদ্ধ করে তার একটা অংশ ভাগীরথী দিয়ে চালিত করে হুগলি-ভাগীরথীকে পুষ্ট করা। স্মতর্ব্য, ফরাক্কার নিচে গঙ্গাধারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে প্রবলতর ধারাটি 'পদ্মা' নাম নিয়ে পূর্বগামিনী হয়েছে। অন্য ধারাটি পশ্চিমবঙ্গে মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্পের গোড়ার নাম ছিল 'The Project for the preservation of the port of Calcutta'। রাজনৈতিক বাধকতায় প্রকল্পটি লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। এটি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

ফরাক্কা প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার জার্মান বিশেষজ্ঞ ড: ওয়ালটার হেনসেনকে নিযুক্ত করেন প্রতিরূপ সমীক্ষার (Simulation Study) সাহায্যে ফরাক্কার জলাধার থেকে ভাগীরথী মারফত হুগলি নদীতে জল ছাড়ার ন্যূনতম পরিমাণ এবং তার কালব্যাপ্তি (duration of release) নির্ধারণের জন্য। উদ্দেশ্য — নদীতে ভাসমান পলিভারের বৃহদংশের সমুদ্রাভিসরণ নিশ্চিত করা যাতে নদীর গভীরতা বাড়ে। ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ ড: ড্রংকার্স-ও পাশাপাশি একই সমীক্ষা করেন। প্রতিরূপ সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দুই বিশেষজ্ঞই তাঁদের অভিমত জানান। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী হুগলি নদীতে ১৯৩৬-এর অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রতিদিন শুখা মরশুমে (জানুয়ারি থেকে মে মাস) নিরবচ্ছিন্নভাবে ন্যূনতম ৪০,০০০ কিউসেক (Cubic feet per second) জল ফরাক্কা জলাধার থেকে ছাড়তে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এঁদের সুপারিশ কোনোদিনই এতাবৎ কার্যকর করা যায় নি।

এর দুটি কারণ। প্রথম কারণ — ফরাক্কার উজানে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে গঙ্গায় ও গঙ্গার জল-দাত্রী নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে সেচের কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে প্রত্যাশিত পরিমাণ জল ফরাক্কায় পৌঁছচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণ — বাংলাদেশের চাহিদা মেটাতে গিয়ে টান পড়ছে ভাগীরথী-হুগলির চাহিদায়। গঙ্গার জলবন্টন নিয়ে এতাবৎ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যে জলবন্টন চুক্তিটি কার্যকর আছে তাতে ভাগীরথী-হুগলি নদী দিয়ে শুখা মরশুমে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৪০,০০০ কিউসেক জল পাওয়া দূর অস্ত। বন্টনযোগ্য জলের অপ্রতুলতা ও অসাম্যের কারণে প্রতিদিনই ফরাক্কা থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের বদল করতে হচ্ছে। এর ফলে হুগলি নদীর ঔদক পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠছে। পলি সংবহনে একরূপতা থাকছে না, নদীর স্রোতপথ বদলে যাচ্ছে, ঘটছে ভূ-সংস্থানগত নানা পরিবর্তন।

এতো গেল হুগলি নদীর উৎসের বিষয়। হুগলি নদীর মোহনার ছবি আলাদা। হুগলি নদীর মোহনা শুরু হয়েছে ডায়মন্ডহারবারের দক্ষিণে কাঁটাবেড়িয়া থেকে যেখানে নদীর প্রসার ২ কিমি-র মতো। কাঁটাবেড়িয়া থেকে হুগলি নদী এগিয়েছে কুপির (funnel) আকারে। হলদিয়া পোতাশ্রয় হুগলি

নদীর পশ্চিম পাড়ে। হুগলি নদীর মোহনায় বেশ কয়েকটি চর আছে। উল্লেখ্য, কাঁটাবেড়িয়া থেকে সমুদ্র-মুখ পর্যন্ত অংশটি হল মোহনার ভেতরের দিক (Inner estuary) আর সমুদ্র-মুখ থেকে একটু ছাড়িয়ে স্যানড-হেডস (Sand heads) পর্যন্ত অংশটি মোহনার বাইরের দিক (Outer estuary)। সাগরদ্বীপ থেকে দক্ষিণে ৮ কিমি-র মধ্যে রয়েছে মিডলটন চড়া, আর ২০ কিমি উজানে অকল্যান্ড চড়া; ৩৮ কিমি উজানে রয়েছে জেলিংহ্যাম চড়া আর ৫৮ কিমি উজানে বালারি চড়া। হলদিয়ার ঠিক উলটো দিকে গজিয়ে উঠেছে নয়াচর দ্বীপ যার আয়তন প্রায় ৩৩ বর্গ কিমি। আজ থেকে ৭০/৮০ বছর আগে এ-জায়গায় কোনো দৃশ্যমান ভূ-খণ্ডই ছিল না। নয়াচর হুগলি নদীর প্রবাহকে বিভাজিত করেছে। মূল ধারাটি বইছে নয়াচরের পূর্বদিকে, রাঙাফলা প্রণালী ঘিরে। নয়াচরের পশ্চিমে হলদিয়া প্রণালীর ওপরই অবস্থিত হলদিয়া পোতাশ্রয়। নয়াচর দ্বীপের উত্তর-পূর্বে বালারি চড়া ক্রমশ বড় হচ্ছে আয়তনে ও উচ্চতায়। কাঁটাবেড়িয়ার দক্ষিণে কুলপির বিপরীতে রয়েছে ডায়মন্ড বালিয়াড়ি যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বালারি চড়ার। রাঙাফলা প্রণালীর দক্ষিণে আছে দুটি মগ্ন চর — লোহচড়া ও বেডফোর্ড। এদেরই সন্নিহিত একটি উদ্ভিন্ন ভূ-খণ্ড — ঘোড়ামারা। তিনটি দ্বীপই অতীতে সাগরদ্বীপের সংলগ্ন ছিল বলে অনুমান। হুগলি নদীর মোহনায় এইসব চড়া, বালিয়াড়ি, দ্বীপের অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায় অব্যাহত পলি-সঞ্চয়ের ফলে নদীর প্রবাহের স্বাভাবিকতা কিভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। 'স্বাভাবিকতা' কথাটা বল হয়ত ছিক হল না। কারণ নদী তো আমাদের ইচ্ছানুসারে চলে না। সে চলে নিজের খেয়ালে এবং সেই সঙ্গে আরোপিত নানা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে। এর ফলে মগ্ন চড়াগুলি জায়গা বদল করে, পলি জমে জমে সৃষ্টি হয় নতুন দ্বীপের। নদীর স্রোতপথও দিক বদল করে।

কোনো খাত সংকীর্ণ হয়, কোনোটা বা হয় গভীরতর। আসলে নিয়ামক কারণগুলির পরিবর্তনশীলতার ফলে এমনটা হয়। হুগলি নদীর মোহনা অঞ্চলে ভূ-সংস্থানগত এবং ঔদক পরিস্থিতির পরিবর্তনের মূল কারণগুলি হল — (ক) ভাসমান পলিভারের মাত্রার পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে পলিকণাগুলির চরিত্রের বদল। (খ) উজান থেকে আসা লবণ-মুক্ত জল ও জোয়ারের সঙ্গে ঢোকা লবণাক্ত জলের পরিমাণের নিত্য অসাম্য। সেই সঙ্গে সমুদ্রোৎসারিত জলের লবণাক্ততার হেরফের। (গ) বাত্যাজনিত ও পোত-চলাচলের ফলে জলের আলোড়ন ও আবর্তের প্রভাব। (ঘ) নদীর গতিপথের ভূমিতি। এছাড়া পৃথিবীর ঘূর্ণনজনিত বলের (Coriolis Force) প্রভাবও মোহনায় অল্পবিস্তর পড়ে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার হুগলি নদীর মোহনায় যে সব খাত বা প্রবাহ-সরণি আছে, তার কোনোটা দিয়ে জোয়ারের জল ঢোকে, কোনোটা দিয়ে ভাঁটার জল যে-সব খাত ধরে সমুদ্রাভিসারী হয়, জোয়ারের জল সে-সব খাত ধরে ভেতরে ঢোকে না। মোহনায় পলি সংবহন মূলত ভাঁটার খাত ধরে হয়ে থাকে। বর্ষার সময় হুগলি নদীতে ভাঁটার আধিপত্য আর বর্ষার ৮ মাস জোয়ারের প্রাবল্য। ভাঁটার খাত যদি জোয়ারের খাতের আড়াআড়ি থাকে, তবে সে খাত বরাবর প্রবাহ শেষ পর্যন্ত নির্বাধ হয় না। তাই সে খাত টেঁকে না, মোহনা অঞ্চলে এমন পরিস্থিতি বেশ কয়েকবার হয়েছে।

ভূ-সংস্থানগত পরিবর্তনও মোহনা অঞ্চলে কম হয় না। স্রোতোবিন্যাস ও পলি-সংবহনের প্রক্রিয়ার পরিবর্তন মূলত ভূ-সংস্থানগত বদলের কারণ। নয়াচর দ্বীপ প্রলম্বিত হয়েছে ও তার মধ্যদেশ হয়েছে স্ফীত, প্রসারিত হয়েছে বালারি চড়া। পোত-সরণিও বদলেছে। জেলিংহ্যাম — হলদিয়া প্রণালী বালারি হয়ে যে পোত-সরণি তিরিশ বছর আগেও চালু ছিল, অব্যাহত পলি-সঞ্চয়ের ফলে তা আজ রুদ্ধ। অথচ হলদিয়া চ্যানেলেই রয়েছে হলদিয়া পোতাশ্রয়ের প্রবেশ দ্বার (Lock Entrance)। বন্দর কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানেই বেশি মনোযোগী, দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে তাঁদের যেন অনীহা। পলি-সঞ্চয়ের পেছনে স্রোতোবেগ ছাড়াও ভাসমান পলিকণার ব্যাস ও সংসক্তি (Cohesiveness) নদীপথের ভূমিতি, পৃথিবীর ঘূর্ণন-জনিত বল (Coriolis Force), জলে লবণাক্ততার মাত্রার অবদান আছে। পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে যখন সমুদ্রের জলতল স্ফীত হয়ে উঠবে, তখন হুগলি নদীর মোহনায় ঔদক পরিস্থিতি কি রূপ নেবে, তা আন্দাজ করা সহজ নয়। হুগলি নদীর মোহনার গাণিতিক প্রতিরূপ (Numerical Model) নির্মাণ করা এজন্য খুব জরুরি যাতে নিয়ামক কারণগুলির মাত্রা বদল করে নদীর ঔদক ও ভূ-সংস্থানগত পরিস্থিতির আভাস দেওয়া যায়। কাজটি কিন্তু মোটেই সোজা নয় কারণ নিয়ামক কারণগুলির বহুলতা ও পরিবর্তনশীলতা।

প্রসঙ্গত একটা তথ্য এখানে দেওয়া দরকার। হুগলি নদীর মোহনায় সঞ্চরণশীল পলিভাবেব পরিমাণ ১.৫ কোটি টনের মতো যা প্রধানত আসে উজান থেকে এবং কিছুটা জোয়ারের সঙ্গে। এর একটা অনুকূল ঔদক পরিস্থিতি এবং পলিকণার

মধ্যক ব্যাস ও সংসক্ততা-সাপেক্ষে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয় — যার সামান্য অংশ পলি খনন করে তোলা হয়। কারণ, পর্যাপ্ত পলি খনন অপ্রতুলতা এবং সেই সঙ্গে পলি খননের বিপুল ব্যয়। উল্লেখ্য, হুগলি নদীর মোহনায় পলির পুনঃসঞ্চারের (re-siltation) হার ৮০%-এর কাছাকাছি যার অর্থ পলি খনন করার পর কিছুদিনের মধ্যে তা আবার ভরে যায়। আসলে পলি-খননের পাশাপাশি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও নেওয়া দরকার যাতে প্রবাহকে পলি খননের ফলে নদীগর্ভের গভীরতর অংশ দিয়ে চালনা করা যায়। শুধু পলি খনন কোনো স্থায়ী সমাধান নয়।

তত্ত্বকথা ছেড়ে বাস্তবের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিকে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ পুনের কেন্দ্রীয় জলশক্তি গবেষণা কেন্দ্রের (Central Water Research Station) পরামর্শে মোহনা অঞ্চলে নাব্যতার উন্নতি বিধানের জন্য একটা সামূহিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাগুলি ছিল — (১) নয়াচরের উভয় প্রান্তে একটি ২.৮ দীর্ঘ প্রবাহ-সঞ্চালক প্রাচীর নির্মাণ (Northern Guide wall)। (২) নয়াচরের দক্ষিণ প্রান্তে ৮ কিমি দীর্ঘ অনুরূপ প্রবাহ-সঞ্চালক প্রাচীর (Southern Guide wall) তৈরি করা। (৩) বালারি চড়ায় পলি খনন।

এছাড়া মোহনার চারটি জায়গায় তটক্ষয় রোধক ব্যবহার বিষয়টিও ঐ সামূহিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নয়াচরের উত্তর প্রান্তের প্রাচীরটির কাজ হল ভাঁটার জলের একটি অংশ বালারি ও হলদিয়া প্রণালী বরাবর প্রবাহিত করা। আর ঐ দ্বীপের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরটির কাজ হল জোয়ারের জলের একাংশ হলদিয়া প্রণালীর দিকে বেশি করে ঠেলে দেওয়া। বালারিতে পলি তোলার উদ্দেশ্য হল হলদিয়া প্রণালী বরাবর প্রবাহকে নির্বাধ করা। তটক্ষয়রোধক ব্যবহার উদ্দেশ্য হল মোহনায় নদীর গতিপথের ভূমিতিকে অক্ষুণ্ণ রাখা যাতে প্রবাহ ছড়িয়ে না পড়ে।

ঘটনা হল, ১৯৯৩ সালে নয়াচরের উত্তর প্রান্তের প্রাচীরটির নির্মাণ শেষ হয়। ১৯৯১-তে বালারিতে পলি খননের জন্য নিযুক্ত হয় এক নামী ওলন্দাজ সংস্থা। কাজ শুরুর আগেই এক আকস্মিক বিধ্বংসী ঝড়ে পলি খননের জন্য আনা ভাসমান নানা অত্যাধুনিক যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক সহায়ক ব্যবস্থাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সংস্থাটি শেষ পর্যন্ত পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যায়। শুরু হয় আইনি বিবাদ যা শেষে ভারত ও নেদারল্যান্ড সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। নিট ফল, বালারিতে তার পর থেকে পলি খননের জন্য কোনো সংস্থাই আগ্রহ দেখায় নি।

১৯৯৮ সালে সামূহিক পরিকল্পনাটি নিয়ে বন্দরের ঔদক গবেষণা বিভাগ নাড়াচাড়া শুরু করেন। নতুন করে একটি প্রতিরূপ সমীক্ষা করা হয় বন্দরের ঔদক গবেষণা বিভাগ ও কেন্দ্রীয় জলশক্তি গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ প্রচেষ্টায়। নতুন করে এই সমীক্ষার কারণ ছিল মোহনার পরিবর্তিত ঔদক ও ভূ-সংস্থানগত পরিস্থিতিতে আগেকার সামূহিক পরিকল্পাডার যাথার্থ্য যাচাই করা। বন্দরের ঔদক গবেষণার সুপারিশে কর্তৃপক্ষ সমীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের জন্য পাঠান জার্মানির হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাত বিশেষজ্ঞ জে. জে সুনডরমানের কাছে। সব দিক খতিয়ে দেখে ড. সুনডরমান নতুন সমীক্ষার সুপারিশগুলিতে নীতিগত সম্মতি জানান কয়েকটি পরিমার্জন সাপেক্ষে। তাঁর অভিমত ছিল — নয়াচরের দক্ষিণ প্রান্তের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ১২ কিমি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বালারিতে পলি তোলার কাজও শেষ করতে হবে। দুটো কাজই সম্পূর্ণ করতে হবে ২১ মাসের মধ্যে। দু'দশক কেটে গেলেও ড. সুনডরমানের সুপারিশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেন নি।

হুগলি নদীর মোহনার সামগ্রিক অবস্থার অবনতি তাই ঠেকানো যায় নি। তাৎক্ষণিক কিছু ব্যবস্থা নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামলাবার চেষ্টা করছেন। তাতে আখেরে কোনো লাভ হবে না। যদি হুগলি নদীর মোহনার হাল ফেরানোর সদিচ্ছা থাকে, তবে আবার নতুন প্রতিরূপ সমীক্ষা করা অবশ্য দরকার যার ভিত্তিতে বালারিতে প্রস্তাবিত পলি খননের খাতের অবস্থান ও পরিমিতি ঠিক করতে হবে। ঠিক করতে হবে, নয়াচরের দক্ষিণ প্রান্তের প্রাচীরের অভিমুখ (Orientation) ও দৈর্ঘ্য। এ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা যে প্রভূত বিপত্তি ডেকে আনবে, তাতে সংশয় নেই।

সহায়ক পাঠ :

হুগলি নদীর গতি ও প্রকৃতি - তপোব্রত সান্যাল (মিরান্দা)।

উমা

উৎস মানুষের বই অনলাইনে

পাওয়া যাবে

Harit Books

www.haritbooks.com

haritbooks@gmail.com

কখন ডাক্তার দেখাবেন?

গৌতম মিস্ত্রী

আমাকে আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এই প্রশ্নটা করেন। তিনি বয়সের হিসেবে বুড়ো, মানে আমার বয়সী। তার সুগার, প্রেশার, হার্টের রোগ ইত্যাদি কিছুই নেই। তাঁকে কোনও ওষুধপত্র খেতে হয় না। কিন্তু তার চারপাশের কমবয়সীরা সবাই গাদা গাদা ওষুধ খেয়ে চলেছেন, কারোর বাইপাস অপারেশন হয়ে গিয়েছে— সব বড় বড় ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করেগেছে — সে কখন ডাক্তার দেখাবে? যদিও তার প্রৌঢ়ত্ব উপভোগে এখনও কোনো উৎপাত দেখা দেয়নি।

'কখন ডাক্তার দেখাবেন' — সাদাসিধে মনে হলেও এটা অতি সুচতুর প্রশ্ন। আইনের ভাষায় একে 'লিডিং কোশ্চেন' বা 'লোডেড কোশ্চেন'। অর্থাৎ প্রশ্নের মাঝেই চালাকি করে একটা অপ্রমাণিত সিদ্ধান্ত ঠাসা আছে। আপনাকে ডাক্তার দেখাতেই হবে, এই ব্যাপারটা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, যেটা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। একটা উদাহরণ দিই — বিপক্ষের উকিল খুনের অপরাধে অভিযুক্ত আসামীকে যদি প্রথমেই প্রশ্ন করেন, 'আপনি ছুরি দিয়ে না বটি দেয় হত্যা করলেন?' এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিলেই সেটা ছুরি বা বটি যাই-ই হোক না কেন আসামী যে হত্যা করেছেন সেটা প্রমাণ হয়ে গেল।

'কখন ডাক্তার দেখাবেন' — এই প্রশ্নের আগে একটা ফয়সালা হওয়া দরকার, তা হল — ডাক্তারকে কেন দেখাবেন? সদুত্তর পাওয়া গেলে বোধহয় মূল প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজন হয় না। তাই প্রথমে কেন ডাক্তার দেখাবেন বা দেখানোটা অবশ্যকর্তব্য কিনা তা নিয়ে আলোচনা জরুরি। নাটক দেখুন, সিনেমা দেখুন, সানন্দে জঙ্গলে অথবা চিড়িয়াখানায় বাঘ-ভাল্লুক দেখুন। 'ডাক্তার' দেখানোটা মোটেই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। ডাক্তার দেখানো এড়ানো যায় কিনা সেটার সুলুক সন্ধান করুন। তারপর না হয় আলোচনা করা যাবে কখন ডাক্তার দেখাবেন।

প্রথম প্রশ্ন, যেটা আমি করলাম তার উত্তর খোঁজা। জগতে এত কিছু সুন্দর জিনিস থাকতে আমরা ডাক্তারের মুখ কেন দেখব? ডাক্তারের শরণাপন্ন হই আমরা দায়ে পড়ে, শখ করে নয়। যখন শরীর বিগড়ে যায় বা প্রাণ সংশয় হয়, ডাক্তার ডাক্তার না দেখিয়ে উপায় থাকে না। ডাক্তার তাঁর বিদ্যা প্রয়োগ করে আমাদের কষ্ট লাঘব করেন, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান। এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। জীবের অমোঘ নিয়তি মৃত্যু। তা দরজায় ঠকঠক করলেও আমরা আরও কয়েকটা বেশি দিন বাঁচতে চাই, অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। এই যুক্তি 'প্রায়' বিনা বিতর্কেই সবাই মেনে নেবেন। 'প্রায়' বললাম, কারণ এখন ইচ্ছামৃত্যুও একটা নূতন অভিজ্ঞান। সে প্রসঙ্গ আমরা বাদ দিচ্ছি। প্রাথমিকভাবে শরীর ও মন ডাক্তারকে দেখাই দুটো উদ্দেশে — (১) রোগভোগ কমানো (২) তাৎক্ষণিক অথবা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মৃত্যু এড়ানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা, অর্থাৎ আয়ু বাড়ানোর কৌশলটা খুঁটিয়ে দেখা যাক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল প্রয়োগ করে ইদানীং মানুষ তাঁর আয়ু বাড়াতে পেরেছে এটা যেমন ঠিক, আবার জলে-জঙ্গলের পশু-পাখি মানুষের বানানো চিড়িয়াখানার ঘেরাটোপে জঙ্গলের চেয়ে বেশিদিন বাঁচে এটাও জানা আছে। এখানে দুটো বেয়াড়া প্রশ্ন — মানুষের আয়ু বাড়ানোর জন্য ডাক্তার দেখানোটাই একমাত্র ও সবচেয়ে কাজের কাজ কি, নাকি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল পাবার অন্যতর আরও উন্নত উপায় আছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, চিড়িয়াখানার জন্তুগুলো খাঁচার ঘেরাটোপের বন্দিদশার বাড়তি আয়ু নিয়ে বেশি খুশি কিনা। জন্তুগুলোর জায়গায় মানুষ থাকলে তাঁদেরও বেশিদিন বাঁচার কথা। কারণ, আপামর বোকা বুদ্ধির (!) জনগণের অভিভাবক, মানে রাষ্ট্র চাইলে তার অধীন মানুষের কাছে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীর বাইরে যাবার উপায় থাকে না। মানুষ কি তাই বলে খাঁচা বন্দি হতে চায়?

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হাতে গোনা কিছু উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মানুষের আয়ু বৃদ্ধির কারণ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা হয়েছে বিস্তর। বোঝা গেছে, সাধারণ মানুষের আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে মূলত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে— আপামর মানুষের শিক্ষার প্রসারে, নবজাতকের টিকাকরণে, পরিশোধিত পানীয় জল আর উন্নত বাসস্থান ও শৌচালয়ের বন্দোবস্তে। এতে ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগগুলি প্রতিরোধ করা গেছে, কমানো গেছে শিশু মৃত্যু আর রোধ করা

গেছে মাঝবয়সের অকালমৃত্যু। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আয়ু কিঞ্চিৎ বাড়ানো গেছে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও প্রয়োগে। তারপরে জীবনের মান আর পরিমাণ আরও উন্নত করার জন্য আর কোনো সহজে প্রয়োগযোগ্য আর পুঁজি নির্ভর সমাজ শাসনতন্ত্রের অনুকূল উপায় উদ্ভাবন করা গেল না। অর্থাৎ বর্তমান গড় আয়ুর শেষের দিকে বেঁচে-থাকা মানুষের আয়ু আর বাড়ানো সম্ভবপর হল না। (https://www.nature.com/scitable/content/life-expectancy-around-the-world-has-increased-19786/)।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উপরে আলোচিত উপায়ে যেটুকু আয়ু বাড়ানো গেছে, তার চেয়ে বেশি আয়ু বাড়ানো বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আর সম্ভব নয়, হলেও সেটা হবে শ্লথ গতিতে। (https://www.thinkadvisor.com/2016/05/27/9-factors-that-affectlongevity/?slretum=202001 16043241)

বেশ কিছু উন্নত দেশগুলিতে বিগত কয়েক দশকে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ৬০ বছরের সীমা অতিক্রম করেছে। কারণ হিসাবে হৃদরোগ ঠেকানোর কথা বলা হয়েছে। ঐ দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর প্রকোপ অনেক আগেই কমানো হয়েছিল। হৃদরোগ নিবারণের অন্যতম কারণ হিসাবে ধূমপান বন্ধ, উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তের উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ। এটা সংশয়াতীত ভাবে বোঝা গেছে। অপর দিকে ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান, কিছু ইউরোপের দেশ, মধ্য এশিয়া এবং সামগ্রিকভাবে নারীদের আয়ু বৃদ্ধির এই সুফল মেলেনি। মহিলারা এমনিতেই ধূমপানে আসক্ত নন। তাঁদের উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তের উচ্চ মাত্রার চিকিৎসার অগ্রাধিকারের বৈষম্য এই সুফলের পার্থক্যের জন্য দায়ী বলে মানা যেতে পারে। (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/Pllso140-6736(14)60569-9/fulltext)।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই জনসমীক্ষাগুলোর সুফল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অগ্রগতির এক অবদান বলে ভুল ভেবে বসি আমরা অনেকেই। সেই কারণেই উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির যন্ত্রযন্ত্রীতে সজ্জিত বেসরকারি হাসপাতালে কালেভদ্রে দু-একটা হৃদ্‌যন্ত্র প্রতিস্থাপন (হার্ট-ট্রান্সপ্লান্ট) হলে সেই খবর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান পায়। আমরা উল্লসিত হই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের চমক দেখে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বরাদ্দে কখনও বড় হাসপাতালের শিলান্যাস হলে আমরা ভাবি, এটা ভারি ন্যায় হল। কিন্তু এটা ভাবতে শিখিনি, সেই উন্নত পরিষেবার ফল খেতে হলে প্রথমে আমাদের রুগ্ন হতে হবে। আমরা ভুলে যাই, ব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তির পরিষেবা কোনোভাবেই দেশের সব রুগীর জন্য কিনা সন্দেহ থেকেই যায়। সরকারি ব্যস্থাপনায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিষেবা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব। আর্থ-সামাজিক অসাম্যের ফলে উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তির মধু কেবল সংখ্যালঘু সচ্ছল ও নগণ্য রাজ-অনুগ্রহ লাভে সফল অসচ্ছল সাধারণ মানুষই পেতে পারেন। সেই মধু ভক্ষণে আপামর মানুষের জীবনের গড় আয়ু ও জীবনের মান বাড়ার কথা নয়। রোগের চিকিৎসা আমাদের লক্ষ্য হতে পারে না। রোগ নিবারণই সাধারণ মানুষের একমাত্র উপায় হওয়া উচিত।

রোগ মুক্তি না স্বাস্থ্য সুরক্ষা ?

রোগভোগ আমাদের অসুস্থ করে ফেললে আমাদের প্রথাগত চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে দেখাতেই হয়। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র চিকিৎসা ? চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা অব্যবহৃত বিশাল বিদ্যা আছে, সেটা অবহেলিত থেকেই যায়। সেটা প্রয়োগ করেন যাঁরা, তাঁরা সেই অর্থে চিকিৎসক নন। তাঁদের স্বাস্থ্যকর্মী বললেই ঠিক বলা যায়। এঁরা আমাদের রোগের চিকিৎসা করেন না বটে, তবে আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন; যাতে আমাদের রুগ্‌ণ হতে না হয় তার চেষ্টা করেন। এঁরাই হলেন স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রকৌশলী। এঁরা হতে পারেন আমাদের বাবা-মা, শিক্ষক, সামাজিক পরিমণ্ডল সাফসুতরো ও স্বাস্থ্যকর রাখার বেতনভুক কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাণ্ডারি, স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিবেশক, এমন কি লোহার রেলিং বিহীন মাঠের ফুটবল।

সামান্য একটা দাঁত মাজার ব্রাশ ও পেস্ট যেমন করে দাঁতের ডাক্তার থেকে আমাদের দূরে রাখতে পারে, পরিশোধিত পানীয় জল, শৌচাগার আর এক টুকরো সাবান আমাদের আন্ত্রিক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে। আবার আমাদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে ধূমপানের নেশা কাটিয়ে ফুসফুসের ক্যান্সার ভীতি থেকে আমাদের সুনিদ্রা উপহার দিতে পারে। সহজ সরল সস্তা স্বাস্থ্যবিধি আমাদের ডাক্তারদের থেকে শতহস্ত দূরে রাখতে পারে। সুতরাং কেন আমাদের ডাক্তারের মুখদর্শন করতে হবে, এটাই বিতর্কের বিষয় হওয়া উচিত।

রোগ নিরাময়ের চেয়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা অধিক কাম্য। বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সুস্থ থাকার একেবারে প্রাথমিক ও প্রাকৃতিক উপায়। মানুষের উদ্ভবের চেয়েও প্রাচীন পৃথিবীর জীবজগতের ইতিহাস। প্রকৃতির মাঝে নেচেকুঁদে বেড়ানো বাঘ,

সিংহ, হাতি, ছুঁচো, ইঁদুর অথবা পিঁপড়ে কিংবা নদী-নালা-সমুদ্রের সাপ, মাছ, তিমি আমাদের চেনা ও অচেনা পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাবের লগ্নে যা যা খেত, যেমনভাবে খাবার সংগ্রহের সংগ্রাম করত বা আপন আপন ইচ্ছে-খুশিতে দৌড়ঝাঁপ করত এখনো তাই-ই করে। এদের ডাক্তার লাগে না। বরং মানুষের বশে থাকার জন্য কিছু কিছু গৃহপালিত পশুপাখির মানুষ-রূপী পশুচিকিৎসক লাগে।

ঘটনাচক্রে আমি গাড়োয়ালের একটা প্রত্যন্ত প্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম বছর খানেক আগে। নিকটবর্তী রাস্তার শেষ প্রান্ত থেকে পৌঁছে গিয়েছিলাম এক প্রান্তিক জনপদে। সেই অভিযানে যাবার জন্য যেখানে ভাড়া করা গাড়ি কোনমতে পৌঁছতে পারে, সেখান থেকে পাঁচ ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে যাওয়া যায় সেই জনপদে। সেখানে মোবাইল তরঙ্গ অথবা বিদ্যুৎ সেখানে পৌঁছায় নি এই একবিংশ শতাব্দীতেও। আমার অদম্য ইচ্ছে ছিল, ওদের চিকিৎসা পরিষেবা সম্বন্ধে জানার। জানলাম, সেই গ্রাম থেকে নিকটবর্তী সরকারি প্রাথমিক মানের চিকিৎসাকেন্দ্র হাঁটা পথে দু দিন। জনপরিবহন ব্যবস্থা নেই। একটা ভাড়ার গাড়ির কড়ি ও সেটার বন্দোবস্ত করতে পারলে অর্ধেক রাস্তা হেঁটে তারপর গাড়িতে চেপে কোনোক্রমে সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছতেই এক দিন লেগে যায়। আধুনিক চিকিৎসার ভগ্নাংশও সেই গ্রাম পৌঁছায় না। তবুও সেখানে নবজাতক জন্মায়, সারাজীবন নেচে কুঁদে বেড়ায়, বয়সকালে দেহত্যাগ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুফলে বঞ্চিত এইরকম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ভারতবর্ষে কম নয়। তবে তাঁরা অকালে মারা যান তেমনটা নয়। চিকিৎসা পরিষেবার আধুনিক সংস্করণে তাঁদের সামিল করা হয় নি সেই আক্ষেপ তাঁদের নেই। তাঁরা মেনে নেন, মৃত্যু বার্ধক্যের অমোঘ পরিণতি। জানলাম, অকাল মৃত্যু সেখানে ঘটে না। আমাদের পায়ে হেঁটে একটা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করার একটা পরিকল্পনা ছিল। ন হাজার ফুট উচ্চতার সেই হিমালয়ের শেষ গ্রামের উপরে ক্রমাগত তিনদিন হেঁটে এক সন্ধ্যায় যখন একটি ১১ হাজার ফুট উচ্চতার এক অতি সুন্দর মনোরম উপত্যকায় পৌঁছলাম, তখন সেখানে একটি প্রান্তিক জনপদের একটি পরিবার কেবলমাত্র এক ব্যাগ আটা আর কয়েকটি কম্বল সম্বল করে সেখানে সাত দিনের জন্য জড়িবুটি সংগ্রহ করতে জন্য এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। চাষের মালিকানা নেই এমন হিমালয়ের প্রান্তিক মানুষদের বেঁচে থাকার রসদ এই হিমালয়ের জড়িবুটি। এগুলো শহরে চড়া দামে বিকোয় আর মধ্যবর্তী দালাল তার মধু খায়। তাঁদের সাথে অনেক গল্পগাছা হল। ঘটনা হল এরা ন্যূনতম আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়াই মূলস্রোতের মতো আয়ু আর সুস্বাস্থ্যের অধিকারি হন। এঁদের সুস্বাস্থ্যের গোপন বিদ্যা হল খ্যাদ্যাভ্যাস আর বেঁচে থাকার জন্য পরিশ্রম, যেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিনা ক্লেশে করে থাকেন।

আপনি তর্ক করতেই পারেন, গত শতাব্দীতে মানুষের আয়ু চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে বেড়ে দ্বিগুণ বা তার বেশি হয়েছে। একথা সত্য। কিন্তু ডাক্তারদের রোগের চিকিৎসার চেয়ে আয়ু বৃদ্ধির এই কৃতিত্ব অনেক বেশি প্রাপ্য মানুষের জীবনের মানের উন্নতি, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা। এই কৃতিত্বের ভাগীদার সর্বজনীন টিকাকরণ ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমিয়ে ফেলা। এইগুলো ঠিক সেই অর্থে রোগের চিকিৎসা নয়, বরং চিকিৎসা বিজ্ঞানলব্ধ স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধির সর্বজনীন প্রয়োগ। এগুলোর জন্য ডাক্তারের চেয়ে স্বাস্থ্যকর্মী আর প্রশাসনিক সদিচ্ছা চাই। রোগের উপশমের চেয়ে অধিক কাম্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ প্রতিরোধের কৌশলের ব্যবহার। ডাক্তারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে রোগ উপশমের ও নিরাময়ের প্রযুক্তি জীবনের মান ও পরিমাণ কিঞ্চিৎ বাড়ায় এ কথাটা মেনেও বলা যায়, এই প্রয়াস যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ আর বেশ খানিকটা অনিশ্চিত। এটার সর্বজনীন প্রয়োগ অসম্ভব। সংখ্যালঘু স্বচ্ছল ব্যক্তিরাই এই পরিষেবা ক্রয় করতে পারেন।

ডাক্তার যে হার্ট অ্যাটাকের রোগীর প্রাণ বাঁচালেন সেই মানুষটি কোনও অর্থেই তাঁর পরবর্তী জীবদ্দশায় হার্ট অ্যাটাকের আগের মতো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন না। বাইপাস অপারেশন বা অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি তার স্বাভাবিক আয়ু ও কর্মক্ষমতা সুনিশ্চিত করতে পারে না, এই একবিংশ শতাব্দীতেও। নিকট ভবিষ্যতে সেটা পারবে এমনটার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। হার্ট অ্যাটাক হলে ডাক্তার দেখাতেই হবে। তার জন্য ডাক্তারের চেম্বার, হাসপাতালের আউটডোর অথবা মামুলি নার্সিং হোমের ডাক্তার হলেও চলবে না। সোজা আধুনিক কালের সবচেয়ে প্রযুক্তি-ঠাসা সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি হতে হবে। আবার আপনার পরিবারের সবাই হয়ত একটু (!) মোটা আর তাঁদের ডায়াবেটিস নামের কেতাদুরস্ত রোগের আভিজাত্য (?) আছে। এটাকে নির্মম পৃথিবীর অমোঘ নিয়তি বা পারিবারিক 'ধাত' বলে মেনে না নিয়ে এই পরিবারের কোনও বিদ্রোহী যদি সচেষ্ট হয়ে দৌড়-ঝাঁপ করা আর পারিবারিক খাদ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেন তবে তিনি কিন্তু ডায়াবেটিস থেকে রেহাই পেয়ে যেতেই

পারেন। ভারতীয়দের শরীর যেন একটা কার্তুজ ভরা বন্দুক, এটা আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রেই পাওয়া, কেবল আমাদের সুস্থভাবে টিকে থাকার জন্য বন্দুকের ট্রিগার না টিপলেই চলবে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞান এই ট্রিগার না টেপার সুলুক সন্ধান আবিষ্কার করে ফেলেছে অনেক দিন আগেই এবং সেটা সফল সেটাও প্রমাণিত। (http://www.indianheartjournal.com/ihj09/may june09/265-274.html)

চালাক চতুর আর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবার উপায় আর সামর্থ্য আছে এমন লোকজন অবশ্য হার্ট অ্যাটাক অবধি আজকাল অপেক্ষা করেন না। সেই সুবিধা পাবার জন্য আপনার শরীর নিয়ে আলাদা করে ভাবার ইচ্ছে আর উপায় থাকা হল প্রাথমিক শর্ত। শর্ত আছে আরও অনেক, শরীর নিয়ে আলাদা করে ভাবার ও সেইমতো রোগ প্রতিরোধের বন্দোবস্ত করার উপায় ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই নেই। সেখানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বিকল্প নেই। আমি ধরে নিচ্ছি, সুস্বাস্থ্য রক্ষার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এই মুহূর্তে নেই, খুব শীঘ্র সেটা হবার সম্ভাবনা নেই। এটাও সত্যি, সেইমতো অবস্থায় আপনি ও আপনার চারপাশের ক্ষুদ্র বৃত্তের মানুষরা একটা সংখ্যালঘু সুবিধজনক অবস্থানে আছেন। মানে খাদ্য, বস্ত্রের বন্দোবস্তের পরেও, আপাতদৃষ্টিতে নিজেকে সুস্থ মনে করলেও ভবিষ্যতে নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ভাবেন। যাঁরা এই বৃত্তের মধ্যে পড়েন না, তাঁদের এই নিবন্ধ পড়ার অবকাশ নেই। তাঁদেরও যাতে ডাক্তারের মুখ না দেখতে হয়, তার জন্য রঙ্গমঞ্চে ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল পৌঁছে দেবার জন্য স্বাস্থ্যকর্মী, চাই রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা আর রোগের চিকিৎসার মধ্যে একটা স্থূল পার্থক্য আছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা সফল হলে ডাক্তারের প্রয়োজন অনেকাংশেই কমে যায়। চিকিৎসা ব্যবসায় মন্দা দেখা যায়। এর প্রামাণ্য উদাহরণ অপ্রতুল, কিন্তু এই পৃথিবীতেই খুঁজলে পাওয়া যায়। উদাহরণ কিউবা, উদাহরণ জাপানের এক অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী। জাপানের ওকিনাওয়ায় মানুষের সর্বাধিক আয়ু বলে জানা যায়, অনেকেই সেঞ্চুরি পার করে দেয়। অথচ, আর্থিক দিক দিয়ে ওকিনাওয়া জাপানের একটি অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল। তাঁদের রোগমুক্ত আয়ুর দাবিদার খাদ্য-বস্ত্রের জন্য তাঁদের অধিক শারীরিক পরিশ্রম, খাবারের অপ্রতুলতা আর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ওকিনাওয়ার খাদ্যাভ্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, 'হারা হাচি' (Hara Hachi), যে কথার অর্থ, ২০ শতাংশ পেট খালি রেখে খাও। (Holloszy JO, Fontana L. Caloric restriction in humans. Exp Gerontol. 2007;42:709-712. http://dx.doi.org/10.1016/j.exger.2007.03.009.PMID 17482403)। ক্যালিফোর্নিয়ার এক দীর্ঘায়ু জনগোষ্ঠী আধপেটা খাবারে সন্তুষ্ট হওয়া আর একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। (Fraser G, Shavlik D. Ten Years of Life Is it a Matter of Choice?)

ডাক্তারের মুখদর্শন করার মতো অপ্রিয় কাজটা করতে না চাইলে সর্বজনীন ভাবে রোগ ঠেকানোর প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে, যার ভূমিকায় ডাক্তারের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই। এই অন্য ধরনের ডাক্তার জীবনের রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে থাকেন, আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কাণ্ডারি তিনি। আমাদের সাথে সেই অন্তরালের সক্রিয় ডাক্তারের মুখোমুখি হবার প্রয়োজন নেই।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এই আলোচনার সুবিধার জন্য রোগভোগগুলিকে প্রাথমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করছি— (১) ঠেকানো যায় এমন রোগ আর (২) এমন রোগ যেগুলো ঠেকানো যাচ্ছে না এই মুহূর্তে। যে রোগগুলো ঠেকানো যাচ্ছে না সেই রোগগুলো বেশ বিরল। আমাদের আদার ব্যাপারিদের সেটা নিয়ে মাথা খাটানোর দরকার নেই। আমাদের রোগভোগের সিংহভাগ, যেগুলো আমাদের প্রায়শই বেকায়দায় ফেলে, যার জন্য আমাদের মাঝরাতে হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সে প্রিয়জনকে নিয়ে দৌড়ে বেড়াতে হয় তাঁকে বাঁচানোর জন্য। তাঁকে বাঁচানোর চিকিৎসার খরচ জোগানোর জন্য আমাদের ধার-দেনা করতেও হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই রোগগুলো প্রথম শ্রেণির রোগ — অর্থাৎ ঠেকানো যায়। আশার কথা এই রোগ ঠেকানোর বিশেষ কোনও খরচপাতি নেই। কেবল ঠেকানো যাচ্ছে না আমাদের অজ্ঞতায় আর আমাদের রাষ্ট্রীয় অন্ধত্বে। ঠেকিয়ে দেওয়া যায় এমন এই প্রথম শ্রেণির রোগ দুরকমের — (১) সংক্রামক রোগ, যেমন আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, পোলিওমালাইটিস, নিউমোনাইটিস, এইড্‌স ইত্যাদি। (২) অসংক্রামক অনিরাময়যোগ্য অস্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীর কুফল স্বরূপ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের স্ট্রোক, কিডনি ফেলিওর। মনে করা হয় এই রোগগুলো আদিম মানুষের হত না।

যে রোগগুলো বিরল, আমাদের তেমন করে মারে না, চিকিৎসায় তেমন করে নিঃস্ব করে না, সেগুলো নিয়ে পরে চিন্তাভাবনা করা যায়। আপাতত কয়েকটা সেই শ্রেণির রোগের

নাম উল্লেখ করে সেই রোগের আলোচনা উহ্য রাখছি। সেই রোগুলির লম্বা তালিকা আছে। যেমন — (১) দুর্ঘটনা জনিত হাড়গোড় মচকে যাওয়া, রক্তক্ষরণ, কেটে-ছড়ে যাওয়া ইত্যাদি। (২) জিনবাহিত ও জন্মগত রোগ, যেমন থ্যালাসিমিয়া, হিমোফিলিয়া। (৩) ক্যান্সার। (৪) বার্ধক্য বা অকাল বার্ধক্য, অস্টিওআরথ্রিটিস, চোখের ছানি, পুরুষদের প্রস্টেট গ্রন্থি বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এর মধ্যে কেবল এক জাতীয় রোগ আমাদের নিঃস্ব করে দেয় যদি ব্যবহারিক দিক দিয়ে বুদ্ধিহীন চিকিৎসা পরামর্শের মাঝে আমাদের পরিত্রাতা কোনো মানবিক ডাক্তারের সন্ধান না পাই। রোগটা হল ক্যান্সার। সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্য সময়ের জন্য তুলে রাখছি।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গড় আয়ু বিগত শতাব্দীতে দ্বিগুণ বা তার কিছু বেড়ে গেছে। বিভিন্ন জনসমীক্ষায় দেখা গেছে, এই আয়ু বৃদ্ধি হয়েছে মূলত প্রথম শ্রেণির অর্থাৎ সংক্রামক রোগ নিবারণে আর হাতে গোনা কয়েকটি উন্নত এবং আদিম জীবন ধারায় আটকে না থাকা জনগোষ্ঠীর দ্বিতীয় শ্রেণির অর্থাৎ অসংক্রামক অনিরাময়যোগ্য রোগ প্রতিরোধে। এই সুফলে ডাক্তারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই সুফল প্রয়োগের কাণ্ডারি হল স্বাস্থ্যকর্মী ও রাষ্ট্র।

ডাক্তারদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে অবশ্য কিছুটা কর্মক্ষম আয়ু বেড়েছে দ্বিতীয় শ্রেণির (অসংক্রামক অনিরাময়যোগ্য) ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক, কিডনি ফেলিওর ইত্যাদি রোগের আধুনিক চিকিৎসার ফলে। প্রথম শ্রেণির রোগ নিরাময়ের প্রযুক্তি কেবল অপেক্ষাকৃত সস্তা আর সফলই নয়, আপামর মানুষের সুদীর্ঘ ও কর্মক্ষম আয়ু অর্জনে এটার ভূমিকাই বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণির রোগের চিকিৎসা আসলে একটা আপোসের বন্দোবস্ত, কারণ এই রোগ প্রকাশ পেলে অন্য উপায় থাকে না। দ্বিতীয় শ্রেণির রোগের প্রতিরোধের কৌশল নিশ্চিতভাবে জানা গেলেও উন্নত দেশগুলো এটার সর্বজনীন প্রয়োগ এখনও তেমন ভাবে করে উঠতে পারে নি। ইউরোপ-আমেরিকা দ্বিধাগ্রস্তভাবে এই পথে এক পা দু পা করে হাঁটা শুরু করেছে। সুইডেনে চিনির উপরে অতিরিক্ত কর, আমেরিকায় চিনিবিহীন বোতলবন্দি মিষ্টি পানীয়ের জনপ্রিয়তা, প্রকাশ্যে ধূমপানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এর উদাহরণ। এর সুফল হিসাবে ঐ দেশগুলোতে এই প্রথম ক্রমবর্ধমান হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কম লক্ষ করা যাচ্ছে। আমেরিকার কিশোর-কিশোরীরা এই প্রথম আগের প্রজন্মের চেয়ে একটু কম মোটা হচ্ছে। অন্যান্য শ্রেণির রোগের বোঝা পরিমাণে কম — তবে জিনবাহিত ও জন্মগত রোগ নিবারণে বিয়ের আগে ঠিকুজি-কোষ্ঠী মূল্যায়নের চেয়ে কিছু ডাক্তারি পরীক্ষা কাজের। ক্যান্সারের প্রকোপ কমাতে ধূমপান, অস্বাস্থ্যকর নাগরিক পরিমণ্ডলের শোধন, নিয়মিত শরীরচর্চা ও স্থূলতা নিবারণ কাজের বলে প্রমাণিত।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি এই আলোচনার মূল বিষয় নয়। সেটা আমরা আগে অনেকবার আলোচনা করেছি এই মাধ্যমেই। আমার বক্তব্য, ডাক্তারদের একবারে অপ্রয়োজনীয় এই মুহূর্তে করা না গেলে এই ডাক্তার পেশার লোকজনদের আমরা বেশি করে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। সুস্থ সমাজে এমন না দিলেও চলে।

যদি আপনি রোগ ঠেকাতে নাই পারলেন অথবা যে সব রোগ ঠেকানোর উপায় মানুষের জানা নেই তখন কী করা?

আধুনিক মানুষকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয় প্রধানত অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য। অসুখ হরেক রকমের — এক-এক রোগে এক-এক ধরনের বন্দোবস্ত। সব রোগের নিরাময়ের অথবা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো একক সমীকরণ নেই। তাই কখন বা কোন ডাক্তারের মুখ দেখতে হবে সেটা কোনও প্রামাণ্য বইয়ে লেখা নেই। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ, বেতার-টিভি, রাস্তার বিলবোর্ড, কাগজের বিজ্ঞাপন আমাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।

কিছু রোগ তার লক্ষণ প্রকাশের পরে চিকিৎসা করলে ক্ষতি নেই — ডাক্তার ধীরে সুস্থে দেখালেই চলে। যেমন সাধারণ সর্দিকাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আন্ত্রিক রোগ এমনকি গেঁটে বাত। যদিও এই সব রোগও নিরাময়যোগ্য, কিন্তু অসফল হলে, রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার পরে চিকিৎসা শুরু করলে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আবার কিছু রোগ প্রকাশ পাবার আগেই জেনে নিতে হয়। সুপ্ত অবস্থায় এই সব রোগ নির্ণীত হয়ে গেলে সেইক্ষণে চিকিৎসা শুরু করে দিলে বড় অঘটন এড়ানো যায়। উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল এই গোত্রের রোগ। যেহেতু এই অস্বাভাবিক অবস্থাগুলো চুপিসাড়ে শরীরে বাসা বাঁধে, এই অবস্থাগুলিকে বিজ্ঞজন রোগ না বলে রোগের উপাদান (রিস্ক ফ্যাক্টর) বা ভাষান্তরে নিঃশব্দ ঘাতক (সাইলেন্ট কিলার) বলে গালমন্দ করেন। যে নামেই ডাকুন না কেন, এই রোগের উপাদান নির্ণয় করার জন্য আপনাকে অধিক সচেতন হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ডাক্তারের

কাছে যেতে হয়, অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ডাক্তারকে আপনার কাছে যেতে হয়। কখন যাবেন আর কতদিন পর পর যাবেন সেটা আপনার জনগোষ্ঠীর রোগের প্রকোপের মাত্রার ও আপনার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে নির্ভরশীল।

এই বিধি, যেটা কিনা উন্নত দেশেও সর্বজনীন করা যায় নি, সেরকম নির্দেশিকা মুষ্টিমেয় স্বাস্থ্য ক্রয় ক্ষমতার সংখ্যালঘু শ্রেণির জন্য রচিত। সেই রকম একটি নিদান বলছে কৈশোর উত্তীর্ণ হলেই শরীরের ওজন, রক্তচাপ, রক্তে সুগার আর কোলেস্টেরলের মাত্রা মাপজোখ করে নিতে হবে, স্বাভাবিক হলে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এমনটা করে যেতে হবে। অস্বাভাবিকতার জালে একবার আটকা পড়ে গেলে নিদান আরও কঠোর হবে। এই সবই হল হৃদরোগ, মস্তিষ্কের স্ট্রোক, কিডনি ফেলিওর ইত্যাদি প্রাণঘাতী রোগের নিবারণের প্রাথমিক স্তরের সুরক্ষা। এটা মিথ্যে নয় মোটেই। প্রাথমিক হলেও এটা স্বাস্থ্য সুরক্ষার দ্বিতীয় বলয়। প্রথম সুরক্ষা বলয়ের নাম 'প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন'— যেটা শুরু করতে হয় নবজাতক অবস্থা থেকে। এজন্য ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ভাবী মা এবং বাবার প্রশিক্ষণ। নবজাতককে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত করার এটাই সুসময়। স্কুল-কলেজ আর রাষ্ট্রের সদিচ্ছা ছাড়া এটা অসম্ভব। এটা সফল ভাবে করা গেলে নিঃশব্দ ঘাতক হিসাবে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আর মাত্রাছাড়া কোলেস্টেরল গোকুলেই বিনাশ হয়ে যাবে।

প্রযুক্তি - পেরিয়ে — শুধু আঙুল নাড়িয়ে ... !

অমিত চৌধুরী

(প্রযুক্তির উন্নতি, যন্ত্রের ব্যবহার— এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভেতরের খুঁটিনাটি ছাড়াও কত ভাবনা-দুর্ভাবনা মনে আসে। প্রযুক্তি পেরিয়ে শিরোনামে সবার কাছে তা পৌঁছে দিতে এই লেখা)

স্পর্শ-পর্দার যুগে — একটু আঙুলই যথেষ্ট। একটি আঙুল নাড়িয়ে— কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একবার বন্ধুদের সঙ্গে রকবাজের মতো হোয়াটস-অ্যাপ-এ আড্ডা দিলাম, ভিডিও কনফারেন্সে দরকারি অফিসিয়াল সভা করলাম ও তারপর, বৈঠকী মেজাজে গানে-গল্পে-ছবিতে পাড়ার প্রতিবেশী কয়েকজনকে নিয়ে রবীন্দ্রস্মরণ। ব্যবস্থাপনা সব করলাম স্রেফ আঙুলের — স্পর্শের সতর্ক নাড়াচাড়ায়। হাত-পা, গা-গতর কিছুই আর নাড়তে হচ্ছে না বিশেষ। ধরতে হচ্ছে না গাড়ি-ঘোড়া। করতে হচ্ছে না আপ্যায়ন। থাকতে হচ্ছে না ফিটফাট। করোনা-কাণ্ডে স্মার্টফোন ও হরেক রকম অ্যাপকে আরো জনপ্রিয় করল! সূক্ষ্ম সঠিক বা স্মার্ট আঙুল-চালনা — চালু করছে, চালাচ্ছে, পাল্টাচ্ছে, জোরে-আস্তে করছে হাতের যন্ত্রটিকে, যা এখন আর নিছক ফোন-যন্ত্র নয়। এ যেন আঙুল-চালিত সব পেয়েছির মন-যন্ত্র। তথ্য খোঁজা, জ্ঞান বোঝা, লেখা-পড়া-শোনার আলাপ-আড্ডা, বিশ্লেষণ-বিনোদন, ছবি-তোলা, অডিও-ভিডিও তোলা-দেখা-শোনা, অনলাইনের সব কাজ বা ইচ্ছেমতো প্রেম-যৌনতা থেকে পিটিশন-প্রতিবাদ — এমনকি অসংখ্য অপকর্মের জন্য আঙুল নেড়ে— হাতে ধরা একটি যন্ত্র ব্যবহার করছে মানুষ। আসলে, যন্ত্র চালাতে হাত-পা থেকে আঙুলের ব্যবহারের যে উত্তরণ তা কিন্তু প্রযুক্তির উদ্ভাবন-উন্নয়নের প্রকাশ। যন্ত্র যতই কর্মকুশল হোক, শ্রমমুক্তি ঘটাক — তার ব্যবহার যত ''সহজ-সরল'' হবে তত তা জনপ্রিয় হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয় তার ব্যবহার। প্রযুক্তি ততই সামাজিক ভূমিকা রাখবে যা কোনো ব্যবহারের বস্তু বা ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে তুলবে মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্তরে 'কিভাবে' এই প্রযুক্তি-পুষ্ট বস্তু বা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান হচ্ছে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল করে দেখবেন, যন্ত্র যখন বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলতে শুরু করল, আঙুলের নানা ব্যবহারে যন্ত্র চালানো গুরুত্ব পেল। নানা মাপের বা ধরনের — নব বা সুইচ ঘোরানো, ওঠানো-নামানো, চাপ দেওয়া, এদিক-ওদিক টানা, নাড়ানো — এরকম কত কারসাজি শিখে নিল আঙুল। তবে 'এসবে' যেটুকু পরিশ্রম — এখন স্পর্শ-পর্দার (Touch Screen) যুগে সেটুকুও 'হাওয়া'। কলম ধরেছিল আঙুল সেই কবে? লিখতে শেখা এক আয়াস-সাধ্য কাজ। হাতের লেখা নিয়ে ছোটবেলায় কত তোড়জোড়। তুলি ধরেছে আঙুল। রেখায়-রঙে কত সৃজন করেছে মানুষ। আর, এখনকার এই আরামের স্পর্শ-চর্চা? এ কি আমাদের শুধু অতি-তথ্য, অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু বা চটজলদি বিনোদনের সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়ি এক অলস, অনড় জীবন-যাপনে জড়িয়ে নিচ্ছে না? স্মার্ট-ফোনের মতো স্মার্টরোবট, স্মার্ট দ্রোন — এরকম অনেক স্মার্ট যন্ত্রই আসছে দৈনন্দিন ব্যবহারে, যা স্পর্শ পর্দায় আঙুল দিয়েই হয়তো চালাতে হবে। হাত-পা না নেড়ে, নড়া-চড়া না করে 'উন্নত', 'উচ্চশিক্ষিত' মানুষেরা জড়ভরত হয়ে যাচ্ছে না তো? আঙুল নাড়তে নাড়তে এসব বড় ভাবায়।

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে মেয়েদের কথা

রিনি নাথ

শেষাংশ

এই চিত্রের বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। অর্থাৎ কেবল শাশুড়ি-ননদই যে খারাপ হত তা নয়, বউও কখনও কখনও কুটবুদ্ধি, মন্দমতি, স্বার্থপর হত। যেমন — সংসারের কাজ করতে অনিচ্ছুক অলস বধূটি কাজে ফাঁকি দেয় এইভাবে —

ধান এল আড়ি আড়ি বৌয়ের হল জ্বরজাড়ি
ধান হল মাড়া ঝাড়া বৌ দেয় পাশমোড়া
ধান তোলা হল সাঙ্গ বৌ উঠে করে রঙ্গ।

কর্মবিমুখ অলস এমন বধূর আরো চিত্র আমরা দেখতে পাই। যেমন — 'দিন গেল হেসে-খেলে, রাত হ'লে বৌ কাপাস ডলে।'

সারাদিন কখনও অসুস্থতার ভান করে, কখনও হেসে-খেলে কাটিয়ে দিয়ে কেউ কাজ শেষ হলেই উঠে বসে, কেউ দিনের কাজ রাতে করে। এরা কিন্তু স্বামীর কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি বজায় রেখে স্বামীর প্রেম আদায় করে নিতে পারে। যেমন — 'সারাদিন থাইক্যা বেটি/হাইরে দেইখ্যা নাকে কাঠি।'

সারাদিন সুস্থ ছিল যে বধূটি, সে-ই স্বামীকে বাড়ি ফিরতে দেখে নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচে চলে। আসলে সে যে সুস্থ নয়, তা প্রমাণ করে স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায়। ননদ-শাশুড়িও যে সবসময় খারাপ হয়, তা নয়, ঘরের বউটিও কখনও কখনও ননদ-শাশুড়ির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। এক্ষেত্রে অবশ্য স্বামী তার সহায় হয়। একটি প্রবাদে দেখি— 'ঢলা ঢলা লাউপাতা/তোমার ভেয়ের গোনাগাঁথা।'

এক্ষেত্রে তার ননদ বাড়ির লাউমাচার দিকে তাকালে বধূ বলছে, ননদ যেন নধর লাউশাক খাওয়ার বাসনা না করে। তার ভাই, বধূর স্বামী গাছে ক'টা লাউপাতা আছে, তা গুনে রেখেছে। সামান্য লাউশাকও দিতে চায় নি সে। এক্ষেত্রে বধূরই স্বার্থপরতা, অনুদারতা, বিষাক্ত-জটিল মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। আবার শাশুড়ির সঙ্গে ব্যবহারেও কোনও কোনও বুদ্ধিমতী নারীকে সমান টক্কর দিতে দেখা যায়। যেমন — 'শাশুড়ি যেমন কাঠি মেপে থোয় দুধ/বউ তেমনি জল মিশিয়ে খায় দুধ।'

শাশুড়ি যেমন পুত্রবধূকে দেবে না বলে কাঠি দিয়ে দুধ মেপে রেখে দেয়, বধূও তেমনি দুধ খেয়ে জল মিশিয়ে আবার দুধের পরিমাণ আগের মতো করে রাখে। এ হল 'যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার শাশুড়িকেই নির্যাতিতার স্থলাভিষিক্ত হতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর নিজের সন্তানই হয়ে দাঁড়ায় বউয়ের হাতের পুতুল। স্ত্রীকে সুখী করতে নিজের মা-কেও অবহেলা করতে দেখা যায় তখন। যেমন — 'মায়ের পেটে ভাত নেই, বউয়ের চন্দ্রহার।/মায়ে বিয়লে মাগে পেলে, কার ধন কার।" অথবা — 'মার গলায় দিয়ে দড়ি, বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।' শাশুড়িদের তাই সর্বদা ভয় থাকে, ছেলে হাতছাড়া হয়ে গেলে তার আর দুর্দশার সীমা—'পরের বেটি সুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে/দুই চক্ষে জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।' নিজের হাতে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ঘর-সংসারের ভার পুত্রবধূর হাতে তুলে দেবার ফল কিন্তু সর্বদা ভালো হয় না। ধীরে ধীরে সমস্ত কর্তৃত্বই চলে যায় বধূর হাতে। অধিকারচ্যুতের হাহাকারও ধ্বনিত হয়েছে আমাদের প্রবাদ-প্রবচনে — 'পুতের বিয়ে আপনি দিলাম, বউ ঘরে এলো/সঁপে দিলাম গেরস্থালী, গিন্নিপনা গেল।'

কর্তৃত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় মর্যাদা। কখনও দাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় তাকে — 'বেটা বিয়লাম বৌকে দিলাম, ঝি বিয়লাম জামাইকে দিলাম।/ আপনি হলাম বাঁদি, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদি।'

সাধারণত পুরুষ যখন একাধিক বিয়ে করত, তখনই স্ত্রীর কথা শুনে চলত, নাহলে স্ত্রীকে মাথায় তুলে মা-কে অবহেলা সেকালে তেমন দেখা যেত না। প্রবাদ-প্রবচনে তার সুস্পষ্ট চিত্র দেখি আমরা—

এক বরে ভাতারের মাগ চিংড়ি মাছের খোসা।
দোজবরে ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোঁসা।
তেজবরে ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়।
চারবরে ভাতারের মাগ কাঁধে চড়ে যায়।

এছাড়া 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' অথবা বেশি বয়সের বউয়ের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যেত — 'আর কালের বউ যেমন তেমন, বয়সকালের বউ মাথায় রতন।'

তবে মনে রাখতে হবে, এই চিত্র সেকালে কমই দেখা যেত। সাধারণত ছোট্ট মেয়েটি বিবাহের পর একান্নবর্তী পরিবারে এসে শ্বশুর-শাশুড়ি-ভাসুর-ননদ-জা সকলের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে একসময় পরিণত হত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে হয়ে উঠত সংসারের গিন্নি। সংসারের দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রথম প্রথম অতিরিক্ত তৎপরতা দেখা যায় তার। এ বিষয়েও প্রবাদের রচনাকারেরা সচেতন — 'বউ গিন্নি হলে তার বড় ফরফরানি/মেঘভাঙা রোদ্দুর হলে বন চড়চড়ানি।' কিন্তু বজ্র আঁটুনিতে সাধারণত ফস্কা গেরোই হয়ে থাকে। অতিরিক্ত তৎপরতায় আসল কাজেই ফাঁক পড়ে যায় — 'তোমার গিন্নিপনা, তেল থাকে তো নুন থাকে না।' সংসারে গৃহিনী হলেন মেরুদণ্ড। সমস্ত অন্তঃপুরের তিনি চালিকাশক্তি। তাঁকে অনেক বেশি ধৈর্যশীলা, দক্ষ, কর্মনিপুণ হতে হয়। সর্বত্র দৃষ্টি রাখতে হয়। নাহলে সংসারটাই ধ্বংস হয়ে যায় — 'রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, গৃহিনীর দোষে গৃহ নষ্ট।'

গৃহিনী হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের আরও একটি বড় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সে দায় মাতৃত্বের। তাই মায়ের কথায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডার। সেখানে দেখা যায়, পুত্র সন্তানের তুলনায় কোনও অংশে কম নয় কন্যা সন্তানেরা। যেমন — 'যে বেটি সেয়ানা হয়/ ঝি বিয়াইয়া আগে লয়।' মেয়েরা বড় হলে মায়ের গৃহকর্মে সহায়তা করে আর ছেলেরা বাইরের কাজে বাবাকে সাহায্য করে। তাই এখানে বলা হয়েছে, আগে মেয়ে জন্মালে সুবিধা হয় মায়েরই। এখানে অবশ্য মেয়েদের প্রতি অসম্মানেরও একটা সুর শোনা যায়। গৃহকর্মনিপুণা হওয়াই যে তার একমাত্র কাজ, তার বেশি কিছু নয়, এই ধারণার ভিত গড়ে দেয় মেয়েদের একান্ত আপনার জন—তার ঘর, তারই মা। গোটা সংসার তো একজন মায়ের কাছে পুত্রসন্তানই কামনা করে— 'গাইয়ের বেটি, বউয়ের বেটা, তবে জানবে কপাল গোটা।' মায়ের লালনে, আদরে, শাসনে শিশু বড় হয়ে উঠতে থাকে। প্রবাদে তাই বলা হয়েছে— 'মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।' অথবা 'মা নাই ঘরে যার, জওলায় বসতি তাঁর।' পৃথিবীতে একমাত্র মা-ই পারেন সন্তানকে প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে ভালবাসতে। সেই কারণেই প্রবাদে বলা হয়েছে— 'মায়ের চাপড়ে হাড় ভাঙে না।' তবে অল্পবয়সে ছেলেমেয়েরা এই শাসনের পিছনে সোহাগ, তাঁর কল্যাণকামনা বুঝতে পারে না। তখন যে শাসন করে না, কেবল আদর করে, তাকেই অনেক বেশি আপন মনে করে — 'মায়ের কাছে কিল চড়, মাসির কাছে বড় আদর।' তবে ভুল ভাঙতেও দেখা যায়। যখন মাকে ছেড়ে অন্য কারও কাছে থাকতে হয়, তখনই স্বরূপ ধরা পড়ে— 'কিসের মাসি, কিসের পিসি, কিল ছাড়া কি ভাতে বসি।' অনেক মূল্য দিয়ে সন্তান বোঝে সকলেরই আদর-ভালবাসা কেবল মৌখিক, হৃদয়ের থেকে উৎসারিত নয়— 'কিসের মাসি, কিসের পিসি, কিসের বৃন্দাবন/মরাগাছে ফুল ফুটেছে, মা বড় ধন।' হয়ত তাই বলা হয়— 'মার চেয়ে যে ভালবাসে, তারে বলি ডান।' মায়ের আদরে, শিক্ষায়, গড়ে ওঠে সন্তানের চরিত্র। প্রাজ্ঞজনেরা তাই জানিয়েছেন তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতার সারাৎসার — 'কোনো মেয়েকে যদি বিয়ে করতে হয় মন/আগে বিচার কর মায়ের চালচলন।'

তবে স্নেহ নিম্নগামী। মায়ের অগাধ ভালবাসার দাম কখনও দিতে পারে না সন্তান। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করে যে মা সন্তানকে বড় করে তোলেন, সেই মায়ের মর্যাদা প্রায়ই দিতে পারে না তাঁর সন্তানেরা। প্রবাদ-প্রবচন রচনাকারদের চোখ এড়িয়ে যায় নি এই অসঙ্গতি — 'মায়ের পরনে টেনা নেই, ছেলের বাঁকা টেরি।' অথবা— 'ঘরের মা ভাত পান না, পরের মায়ের তরে কান্না।' ছেলে তাঁকে ছেড়ে গেলেও, তাঁকে ভুলে গেলেও, মা কখনও ছেলেকে ভোলেন না, ভাল না বেসেও থাকতে পারেন না। তাই বলা হয়েছে— 'মায়ের হাড় যদি মাটিতে থাকে পঁতা/মাটি থেকে বলে — বাছা আমার কোথা।'

এভাবেই নারীজীবনের প্রতিটি পর্যায়ের চিত্র আমরা যেমন পাই প্রবাদ প্রবচনে, তেমনি পেয়ে যাই নারীচরিত্রেরও পরিচয়। কখনো দেখি চঞ্চলচিত্ত নারীকে— 'গড়ায় যেমন পদ্মপাতায় জল/মেয়েদের মন তেমনি চঞ্চল।' কখনও পাই তাঁর শক্তির কথা— 'অবলার মুখেই বল।' শারীরিক শক্তি না থাকলেও স্ত্রীজাতির মুখের জোর যথেষ্ট। কখনও দেখি কোনও নারী বিশ্বাসযোগ্য কি না, তারই সূত্রবিশেষ— 'কাস্তে, কালসাপ, বেদো নারী, তিনজনকে পরিহরি।' অথবা— 'কাঁদুনে পুরুষ আর হাসিয়ে মেয়েকে/বিশ্বাস কখনো করো না জীবনে।'

কখনও নারীজাতিকে অসম্মান, সম্ভবত কোনও পুরুষই এই জাতীয় প্রবাদের উদ্ভাবক। যেমন— 'মেয়েরা কোথায় ছুরিতে দেয় ধার/শয়তানও তা জানতে মানে হার।' অথবা— 'পথি নারী বিবর্জিতা।' মেয়েদের পরামর্শ নিয়ে চলা যেন মর্যাদাহানিকর পুরুষের পক্ষে। প্রবাদ-প্রবচনগুলিতেও এ বিষয়ে প্রমাণ আছে— 'মেয়েদের পরামর্শ, সর্বনাশের মন্ত্র।' 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী।'

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের যে কতভাবে পিছনে ফেলে

রাখার, গৃহবন্দী করে রাখার আয়োজন চলত, প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে তার জীবন্ত প্রমাণ মেলে। যেমন — 'নরের কাজ লড়তে যাওয়া/নারীর কাজ শিশুর জন্ম দেওয়া।'

এইসব প্রবাদ-প্রবচন থেকে নারী সম্পর্কে সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসে, তা হল— প্রথমত, নারীকে গৃহবন্দী করে রাখাই ভাল। কারণ হাটে-ঘাটে-বাটে বের হলেই কুলবধূ আর সতী থাকে না। দ্বিতীয়ত, সময়, সুযোগ আর যোগাযোগের মাধ্যম না পেলে তবেই মেয়েরা সতী হয়, নচেৎ নয়। তৃতীয়ত, স্ত্রীলোকের মৃত্যু না হলে তার চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। চতুর্থত, যৌবন চলে না যাওয়া পর্যন্ত কোনও নারী সতী হয় না। অর্থাৎ সতী নারীর জয়গান যতই করা হোক না কেন, যতই তাকে দেবীত্বের মহিমা দিয়ে উচ্চাসনে বসানো হোক না কেন, 'সতীত্ব' আসলে একটি ধারণা মাত্র। কিন্তু কী আশ্চর্যের ব্যাপার, পুরুষ তো নিজেরাই কোনও সম্পর্কে বিশ্বস্ত, অবিচল বা একনিষ্ঠ নয়। না হলে সমাজে বহুবিবাহের চলটাই থাকত না। নারীর সতীত্বে পুরুষের অবিশ্বাস, কিন্তু নারীকে ভুলপথে অথবা অসতী করতে একজন পুরুষেরও তো দায়িত্ব থেকে যায়। তাই তো প্রবাদে বলা হয়েছে— 'পুরুষ আর স্ত্রী, আগুন আর ঘি' অথবা 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী, তপ্ত অঙ্গারসম পুমান।' সোজা কথায়, এক হাতে তালি বাজে না। একজন পুরুষই তো একটি নারীকে তার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব পারিবারিক জীবনের ভিত্তি থেকে বিচ্যুত করে অনিশ্চিত জীবনে ভাসিয়ে দেয়। কারণ তার কাছে বিগতযৌবনা নারীর কোনো কদর নেই— 'যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।' পুরুষের যৌবন তো চিরস্থায়ী, কিন্তু নারীর যৌবন? — 'যৌবন জোয়ারের পানি/কাল থাকতে বুঝলে না নারী।' নারীর যৌবন চলে গেলে আর আদর থাকে না। পুরুষের ওপর সে নির্ভরশীলা। 'মেয়েমানুষের পরের ভাগ্যে খাওয়া পরা।' তাই যৌবন চলে গেলে তার আর আশ্রয় কিছু থাকে না। তখন ঈশ্বর বিনা গতি নেই। অর্থাৎ ভক্তিও নির্ভর করছে বয়সকালের উপর— 'এককালে বিলাসিনী, শেষ কালে তপস্বিনী।' 'আম শুকিয়ে আমসী, জল শুকিয়ে পাঁক/ বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে খাক।'

তবে সুস্থ স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের কথাও প্রবাদ-প্রবচনে আছে। কারণ প্রতিটি নারী-পুরুষ অবিশ্বস্ত হলে সমাজব্যবস্থার ভিতটাই ভেঙে পড়বে। তাই পুরুষ যতই মনে করুক, 'ভাগ্যিমানের ইস্তিরি মরে/আভাইগ্যার ঘুরা মরে', নারী কিন্তু মনে করে — 'নেই যার অর্ধাঙ্গিনী, সে তো ছাতহীন ঘরখানি।'

সেকালে মেয়েদের পুরুষেরা যে সস্তা, হেলাফেলার বস্তু মনে করত, তারই প্রতিবাদে অন্দরমহলের মেয়েদের রচিত প্রবচন— 'মাগ মরা/ লক্ষ্মীছাড়া'। বিপত্নীক পুরুষকে তারা মোটেই পছন্দ করত না। স্ত্রী তো ঘরের লক্ষ্মী। 'সেই ধানে সেই চাউল, গিন্নি বিনা আউল থাউল।' অর্থাৎ সংসার চলবে আগের মতোই, জীবন তো চলমান। পুরুষের বহুবিবাহকেও নারীরা সুনজরে দেখে নি। সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁরা বারবার এ বিষয়ে পুরুষকে সাবধান করার চেষ্টা করেছেন— 'দুই বউ যার, নিত্য কাচাল তার/এক বউ যার, দুধভাত তার।' 'দুই স্ত্রী যার বড় দুঃখ তার।' 'দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নি ভাত পান না।'

সব মানুষই খারাপ হয় না। সেকালের সমাজে দুশ্চরিত্র নারীর অসম্মান, নারীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা যেমন ছিল, কেউ কেউ নারীকে সম্মানও দিয়েছেন। যেমন — 'স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি'। 'স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।'

এভাবেই বাংলা প্রবাদ-প্রবচনে আমরা একটি মেয়ের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় গোটা জীবনের ছবিই পেয়ে যাই। কন্যা, জায়া, জননী, শাশুড়ি— মেয়েদের প্রায় প্রতিটি রূপের পরিচয় পাই এখানে। সেকালের সমাজের মেয়েদের জীবন, যে জীবন এই তো কিছুদিন আগেই ছিল সূর্যের আলোর মতো সত্য, নদীর স্রোতের মতো বহমান, আজ যা হারিয়ে গিয়েছে, সেই জীবনের জীবন্ত চিত্র এখানে প্রত্যক্ষ করি। অনুভব করি মেয়েদের প্রাণস্পন্দন, উপলব্ধি করি হারিয়ে যাওয়া সেই জীবনের চূর্ণাংশ। দেশ বদলায়, সমাজ বদলায়, বয়ে যায় সময়, কিন্তু বদল হয় না মানুষের মনের, তার অস্তিত্বের। তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেকাল-একাল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বিশেষত নারীমনে। মানুষেরই ভূয়োদর্শন, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা মানুষকে পথ দেখাতে পারে। জীবনের চড়াই-উতরাই পার হতে গিয়ে এ কালের নারীকেও তাই পথ দেখাতে পারে যুগে যুগে রচিত হওয়া এসব প্রবাদ-প্রবচন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলার প্রবাদে নারীমন, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯১।

২। প্রবাদ প্রবচন, সবিতা দত্ত মজুমদার, থীমা, কলকাতা, ২০০৪।

৩। প্রবাদমালা, কল্যাণী দত্ত, থীমা, কলকাতা, ২০১২।

৪। প্রবাদকোষ, ড. দুলাল চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১২।

উমা

চিঠিপত্র

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

উৎস মানুষ পত্রিকার এপ্রিল-জুন, ২০২০ সংখ্যায় 'বহুবিবাহ প্রসঙ্গে অক্ষয় কুমার ও বিদ্যাসাগর' রচনায় প্রদীপ্ত গুপ্তরায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সমাজ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। লেখক এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তর ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই বহুবিবাহ প্রথা স্তিমিত হয়ে যেতে থাকে, কারণ ঐ সময়ে বাংলার বিভিন্ন মনীষীদের সদর্থক ভূমিকা এবং ব্রাহ্মসমাজের লাগাতার বিধবা পুনর্বিবাহ, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে আন্দোলন চলছিল তা মানুষকে সচেতন করতে সাহায্য করে। অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনমনীয় প্রতিবাদী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিশেষ করে বাঙালি সমাজে বহুবিবাহ প্রথার গুরুত্ব একেবারে নেই বললেই চলে। স্বভাবতই ঐ সময়ের সাথে বর্তমান সময়ের তুলনা একটু বেমানান। প্রদীপ্তবাবু শেষে লিখেছেন যে, বর্তমান সমাজে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বেশ কিছু পুরুষের আইনত একটি স্ত্রী আর বেআইনি স্ত্রী রয়েছে, যা বহু বিবাহেরই অন্যরূপ। প্রবন্ধের উপসংহারে এরূপ মন্তব্য অযৌক্তিক বলেই মনে হল। এক্ষেত্রে বহুবিবাহ প্রথার ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপটটির মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেল।

বহুবিবাহ, নারীদের অন্তপুরের কথা এবং তখনকার সমাজে মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে নিস্তারিণীদেবীর (১৮৩২-১৯১৫) অকপট স্বীকারোক্তি তাঁর 'সেকেলের কথা' বইটিতে এক করুণ ছবি তুলে ধরে। নিস্তারিণীদেবী শেষ বয়সে যখন চোখে দেখতে পান না তখন তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে মৃত্যুর তিন বছর আগে জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলে গিয়েছেন। সেই সব স্মৃতিকথা 'সেকেলের কথা' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল।

এ বিষয়ে মালবিকা কার্লেকার তাঁর গবেষণামূলক লেখাগুলিতে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিস্তারিণী দেবী সে সময় মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের যে ছবিটি তুলে ধরেছেন তা আজকের দিনেও বিশেষ চোখে পড়ে না। বর্তমান সময়ের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা না ধরাই ভাল। মালবিকা কার্লেকার তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে লিখেছেন যে, বরেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের থেকে রাঢ়েন্দ্রিও ব্রাহ্মণেরা বিশেষ করে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে অনেক বেশি সংখ্যায় ঐ প্রথার সাথে জড়িত ছিল। লেখকের উল্লিখিত সারণির নামগুলি হুগলি জেলার, যা এই তথ্যকেই মান্যতা দেয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণির উচ্চবর্ণের কুলীন এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরাই ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের বহুবিবাহের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করত। এ ধরনের বহুবিবাহের কুপ্রথার প্রভাব বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। ভাবতে অবাক লাগে যে, নিস্তারিণীদেবীর ভাই ছিলেন রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জী এবং উনি ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মামীমা, অথচ নিজে কখনো শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারেননি। বিয়ের পর কখনো শ্বশুরবাড়ি যাননি, স্বামীকে কদাচিৎ দেখেছেন এবং কুড়ি বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন, তাঁর দিন কেটেছে ভাই বোনেদের বাড়িতে বেগার খেটে। অবশেষে বার্ধক্যের কারণে কাশীবাসি হন এবং সেখানেই ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হন। সেই সময়ে এরকম অনেক মেয়েদের কথা ইতিহাসে নীরব সাক্ষী থেকে গেছে, যার খানিকটা ইঙ্গিত উল্লিখিত রচনাটির ২নং সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বহুবিবাহ আইনি বা বেআইনি যাই হোক না কেন, বর্তমানে এটা কোনো সামাজিক সমস্যাই নয়।

ব্রিটিশ সরকার বহুবিবাহ প্রথা রদ করার জন্যে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে কমিটি করে, কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রদীপ্তবাবু লিখেছেন — ''কমিটির রিপোর্টে কিন্তু বিদ্যাসগররা 'সাধারণের বোধ জাগ্রত হলে এই স্বেচ্ছাচারিতা কমবে' — এই ধরনের একটা মন্তব্য করে সমস্যাটির পাশ কাটিয়ে যান।'' ... বিষয়টির এটি একটি সরল ব্যাখ্যা এবং

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সাথে ঠিক মেলানো যায় না। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ আপিল করেন গভর্নমেন্ট অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। আরো একটি আবেদন প্রায় ২১০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে কোম্পানির কাছে জমা পড়ে, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে উচ্চবর্ণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও জমিদাররা ছিলেন। উল্লেখ্য এই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন বলবৎ করে ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে মূলত কোম্পানির শাসিত অঞ্চলগুলিতে। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এর পরেই দেশ জুড়ে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় এবং কোম্পানিকে বেশ বেগ পেতে হয় বিদ্রোহ দমন করতে। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশদের ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। সহজেই অনুমেয় স্থানীয় বিষয়গুলো নিয়ে কোম্পানির ভাবনা চিন্তা করার তখন অবকাশ ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ করা হয়, যার ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে যায়, অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান আইন চালু হয়। পার্লামেন্টে ঐ বিলে উল্লেখ করা হয় যে, ভারতবর্ষে সাধারণভাবে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করা হবে না এবং ভারতীয়দের সরকারি কাজে নিয়োগ করা হবে।

ঠিক এই সময়ে ১৮৫৮ সালের ৭ অগাস্ট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যশোরে কাজে যোগ দেন পরবর্তী পর্যায়ে ১৮৬৪ সালে ৫ মার্চ বারুইপুরে বদলি হয়ে আসেন এবং সরকারি আমলাদের বেতন নির্ধারণের জন্য কমিশনের দায়িত্ব পান। এই সূত্রে তখনকার ছোটলাট সিসিল বিডনের (বিডনের কার্যকাল: ১৮৬২-১৮৬৭) এবং তাঁর সেক্রেটারি সি ই বাকল্যান্ডের সাথে বিশেষ পরিচিত হন। প্রদীপ্তবাবু উল্লেখ করেছেন যে বহুবিবাহ রদ করার বিষয়ে আবার ১৮৬৩ সাল থেকে যখন নাড়াচাড়া শুরু হয় তখন বেশ কিছু উচ্চবর্ণের কুলীনেরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। মজার বিষয় হল এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন। সিসিল বিডন বিষয়টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তথাপি তখনকার সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় ভাবাবেগ ও কিছু উচ্চবর্ণের মানুষের বিরোধিতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করে। তখনও ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলত গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কারক আইন প্রয়োগ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এস কে অধিকারী তাঁর 'বিদ্যাসাগর অ্যান্ড দি রিজেনারেশন অফ বেঙ্গল' (১৯৮০) বইটিতে এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে বিদ্যাসাগরের বিধবা পুনর্বিবাহ আইন লাগু করা এবং বহুবিবাহ প্রথা রদ করার বিষয়ে মতভেদ ছিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত মালবিকা কার্লেকারের গবেষণায় দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানসিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাই 'বিষবৃক্ষ' আখ্যানে, যেখানে বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিবাহের পর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বিধবা রোহিণীকে প্রণয়ীর হাতে গুলি খেয়ে মরতে হয়। বঙ্কিম রচনায় বিধবা মহিলাদের জোরালো উপস্থিতি থাকলেও তাঁরা উপসংহার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। 'দেবীচৌধুরানি' উপন্যাসে প্রফুল্ল (দেবীচৌধুরানি)-কে সর্বগুণে তৈরি করে শেষে নতুনবৌ হিসেবে দুই সতীনকে সঙ্গে নিয়ে সুখে সংসার করতে দেখা যায়, যা সামাজিক বহুবিবাহকেই মান্যতা দেয়। যদিও এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৭৭২ তবুও মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে মানসিক বিরোধিতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন বহুবিবাহের গুরুত্ব আপনিই সমাজ থেকে চলে যাবে, এর জন্যে কোনো সামাজিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। ঘটনাক্রম থেকে অনুমান করা যায় বাংলায় তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের বহুবিবাহ প্রথা রদ করা নিয়ে সদিচ্ছা থাকলেও, পারিপার্শ্বিক চাপ ও তখনকার সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তারা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি। সুতরাং বিদ্যাসাগরেরা সমস্যাটির পাশ কাটিয়ে গেছেন বলাটা সমীচীন হবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরিসর দরকার।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় বইটি সম্পর্কে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ফলস্বরূপ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে টানাপোড়েন তখনকার সমাজকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়তার সাথে বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন যে কতটা ভ্রান্তিমূলক ছিল তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন। নীচের তথ্যসূত্রে তারই কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. আত্মকথা বইয়ের অংশ— 'নিস্তারিণী দেবী: সেকেলের কথা', এন সি জানা ... ভলিউম ২, অনন্যা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮২

২. ‘বিদ্যাসাগর অ্যান্ড দি রিজেনারেশন অফ বেঙ্গল’, এস কে অধিকারী, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮০
৩. ‘ভয়েসেস উইদিন — আর্লি পার্সোনাল ন্যারেটিভস অফ বেঙ্গলি উওমেন’ — মালবিকা কার্লেকার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৯১
৪. ‘উওমেন্স এডুকেশন ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া—টি ফার্স্ট ফেজ’, জে সি বাগাল, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৬
৫. ‘বিদ্যাসাগর: দি ট্রাডিশনাল মডার্নাইজাক’, অমলেশ ত্রিপাঠী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, বম্বে, ১৯৭৪
৬. ‘বঙ্কিম রচনাবলী— দ্বিতীয় খণ্ড’, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৬৫, (শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগাল কর্তৃক সম্পাদিত)

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের মুখবন্ধে লিখেছিলেন— [...“স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীও দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতয়েব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছি।” ...] পৃ: ৩১৪

‘‘...তবে বহুবিবাহ এ দেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলি জেলায় যতগুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সাথে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলি জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাংলায় এক কোটি আশি লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠার শত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদনপরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদনপরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন দিন কমিতেছে, স্বতঃই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না — কোন রাজব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না — কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে, এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষসবধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন্‌কুইক্সোট্‌কে মনে পড়িবে ...” পৃ: ৩১৫

শ্যামল ভদ্র

উমা

বাণিজ্যিক নয়
মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উয়ুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল।
পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর : ৯৮৪০৯২২১৯৪ বা ৯৩৩১০১২৬৩৭

সংগঠন সংবাদ

মানুষের পাশে আসানসোল ব্রাদারহুড সংস্থা

লক ডাউন পিরিয়ডে আসানসোল ব্রাদারহুড স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অঞ্চলের দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। রেলপাড়া, নমোপাড়া, মহিশীলা কলোনির প্রায় ৯০০ পরিবারকে চাল, ডাল, আলু, সয়াবিন, তেল খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সংস্থাটি ত্রাণ কাজ করেছে। এই উদ্যোগের নাম ছিল 'জঠর'। লক ডাউন পিরিয়ডে বৃদ্ধাশ্রমের (প্রান্তিক) সদস্যদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে প্রয়োজনীয় রসদ। শুধু তাই নয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের জন্যে পানীয় জল, ও আর এস-এর ব্যবস্থা করেছে। এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছে 'পিপাসা'। এছাড়া এই সংস্থা আসানসোলের ডাক্তার, নার্স, পুলিশ, সাফাইকর্মীদের সম্মান জানানোর জন্য 'লহ প্রণাম' নামে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে। তাদের হাতে তুলে দিয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, মাস্ক, গ্লাভস এবং সাম্মানিক হিসাবে কিছু অর্থ ও স্মারক। আসানসোলের এক জন মানুষও যেন এই সময় অভুক্ত না থাকেন সেদিকেও সদস্যদের যথেষ্ট নজর ছিল। সংস্থার সদস্যরা নিজেরা চাঁদা তুলে এবং আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের থেকে চাঁদা তুলে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিবেদক : কাকলী কুন্ডু

একটি প্রতিবেদন

করোনা-কালে উমপুন্ সাইক্লোন-এর তাণ্ডব — যাঁরা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন

যে সময় এই লেখা লিখতে বসেছি তখন ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা অনেক দেশকে টপকে শীর্ষের দিকে ছুটছে। এই মুমূর্ষু পরিস্থিতিতে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো নেমে এসেছে উমপুন্। এক প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোন। কলকাতার বাসিন্দা বিশেষ করে যারা শহরের পূর্বদিকে থাকেন, তাঁরা ভালোই আন্দাজ পেয়েছেন, কী হতে পারে সাগরদ্বীপ বা হিঙ্গলগঞ্জে। গত মে মাসের ২০ তারিখে উমপুন্ বকখালির ডাঙায় ওঠে। বলা হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়টির আই যখন পূর্ব কলকাতার কালিকাপুরের ওপর, তখন তার ক্লাউড ওয়ালটির বিস্তার সেই বাগনান পর্যন্ত। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে উমপুন্।

আমাদের 'উমপুন্ ভলান্টিয়ার গ্রুপ' থেকে দুই ২৪ পরগণা, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলিতে মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছিলাম। রায়দিঘি ও মথুরাপুর অঞ্চলে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই অধিকাংশ ঘরবাড়ির চাল উড়ে গেছে। চাষবাস, পশুপালন, মুরগির পোল্ট্রি র ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সাহায্য করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের ছিল না। সে কারণে আমরা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। মেডিক্যাল ক্যাম্পের পাশাপাশি বন্ধুদের সাহায্যে ত্রিপল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বর্ষা নেমে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। ৫ জুনের ক্যাম্প হবার কথা ছিল দেউলবাড়িতে। কিছু সমস্যার জন্য তা স্থানান্তরিত করা হয় মথুরাপুরের লালপুরে। মেডিক্যাল টিমের দায়িত্বে ডাক্তার অর্ণব সাহা ও এই প্রতিবেদক ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী সাকিরুদ্দীন শেখ। বীরভূমের মল্লারপুর উৎনৌ থেকে কুনাল দেব ও কলকাতার বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিটের উত্থান সংস্থা থেকে ডাক্তার সংঘমিত্রা মুখার্জি এসেছিলেন ২০০ ত্রিপল নিয়ে, এই ত্রিপল দিতে তাঁদের সাহায্য করেছেন সানরাইজ কোম্পানি ও ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শুভাশিস দে। কিন্তু আগের দিন ওখানে কিছু রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য ক্যাম্প করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হয় এবং জানা যায় ওই অঞ্চলে প্রচুর ত্রিপল আসায় সেখানে ত্রিপলের প্রয়োজনও আর নেই। এই কারণে আমরা ক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে আসি মথুরাপুরে লালপুর গ্রামে। বি.পি.এইচ.সি-র ঘরে আমরা রোগী দেখতে শুরু করি। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম, যেমন জলঘাটা, রাণাঘাটা, দেবীপুর ও আরও কিছু জায়গা থেকে রোগীরা দেখাতে আসেন। সেই অবসরে কৃষ্ণচন্দ্রপুরের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় চন্দন মাইতির সঙ্গে কুনালবাবুরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুর্গত মানুষদের ত্রিপল বিতরণ করেন। ৪ জুন যাদবপুরের কোয়ারেন্টাইন স্টুডেন্টস গ্রুপের সদস্যরা কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল গিয়ে ত্রিপল ও এক সপ্তাহের মত রেশন দিয়ে আসেন। সেই খাদ্যসামগ্রী দিয়ে কমিউনিটি কিচেন খোলেন চন্দনবাবুরা। লোকজন ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরে মেডিক্যাল ক্যাম্পে আসেন। বিকেল পৌণে পাঁচটায় ক্যাম্পটি শেষ হয়। বাইরে তখন রোগীর ভিড়। ঐ ক্যাম্পে ১৯০ জন রোগী দেখা হয়। আবার মেডিক্যাল ক্যাম্প হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা ফিরে আসি।

প্রতিবেদক : শর্মিষ্ঠা রায়